স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল
দ্য ম্যারাকট ডিপ
অবলম্বনে
অতল জলের শহর
অনুবাদ অদ্রীশ বর্ধন

স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল
দ্য ম্যারাকট ডিপ
অবলম্বনে
অতল জলের শহর
অনুবাদ অদ্রীশ বর্ধন

অতল জলের শহর

অতল জলের শহর

অদ্রীশ বর্ধন

স্যার আর্থার কনান ডয়াল বিরচিত

‘দ্য ম্যারাকট ডিপ’ কাহিনির ভাবানুবাদ

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

যৌথ প্রয়াস

প্রকাশকের কথা

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের বয়স নেহাত কম নয়। তবে নিঃসন্দেহে তা এক নতুন গতি পেয়েছিল ১৯৬৩ সালে, অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত 'আশ্চর্য' পত্রিকার হাত ধরে। কালের নিয়মে আজ বিস্মৃতির অন্তরালে সেই সুবর্ণ যুগের অনেক কিছুই। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের হারানো অতীতকে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর কল্পবিশ্ব প্রকাশনী। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু নতুন লেখক, নবীন প্রতিভাকে সামনে আনাই নয়। কল্পবিজ্ঞানের ঐতিহ্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরাও আমাদের স্বপ্ন।

'অতল জলের শহর' একটি কল্পবিজ্ঞান অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। এটি স্যার আর্থার কন্যান ডয়েলের লেখা 'ম্যারাকট ডিপ' উপন্যাসের ভাবানুবাদ। মূল উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন'-এর পাতায় ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস অবধি। উপন্যাসটির শেষাংশ ওই ম্যাগাজিনেই প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য লর্ড অব দ্য ডার্ক ফেস' নামে ১৯২৯ সালের এপ্রিল ও মে মাসে। ২০০৮ সালে অদ্রীশ বর্ধনের কলমে উপন্যাসটির প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয়া শৈবভারতী পত্রিকায়। এবার বাংলা কল্পবিজ্ঞানের আগ্রহী পাঠকদের জন্যে পত্রিকার পাতা থেকে উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশ করা হল। ফ্যান্টাসটিক প্রকাশনের সঙ্গে যৌথভাবে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিতে পেরে আনন্দিত কল্পবিশ্ব। বই প্রকাশের দায়িত্ব ও অনুমতি দেওয়ার জন্যে অদ্রীশ বর্ধনের পুত্র অম্বর বর্ধনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বইয়ে ব্যবহৃত ছবিগুলি রেনে জিফে এবং অ্যান্টন ও. ফিশারের আঁকা।

আশা করি, কল্পবিশ্ব ও ফ্যান্টাসটিকের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত 'কল্পবিশ্ব ক্লাসিকস'-এর অন্তর্গত এই কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসটি কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় যোগ্য সমাদর পাবে। পাবে পাঠকের অপার ভালোবাসা।

প্রকাশক
জুলাই ২০২০

'দ্য ব্রিজপোর্ট টেলিগ্রাম' সংবাদপত্রে
১৯২৭ সালের ৬ অক্টোবর প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

এই যে কাগজপত্র আমার হাতে এসেছে সম্পাদনার জন্যে, সে কাজে হাত দেওয়ার আগে জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই একটা ব্যাপার। ‘স্ট্র্যাটফোর্ড’ জাহাজটা এক বছর আগে অভিযানে বেরিয়েছিল সমুদ্রবিদ্যা অর্জনের অভিলাষ নিয়ে। গভীর সমুদ্রের জীবজগৎ নিয়ে তথ্য আহরণের উদ্দেশ্য নিয়ে। বাষ্পচালিত এই জাহাজ নিয়ে অভিযানের সংগঠক ছিলেন ডক্টর ম্যারাকট— নিতল সমুদ্রের জীবজগৎ নিয়ে দু-খানি গ্রন্থ রচনা করে যিনি জগৎ প্রসিদ্ধ। ওঁর সঙ্গে ছিলেন মিস্টার সাইরাস হেডলে— কেমব্রিজের প্রাণীবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন সহকারী। অভিযানের সময়ে তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের ‘রোড্‌স স্কলার’। জাহাজের দায়িত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ নাবিক ক্যাপ্টেন হোয়ি। তেইশজন নাবিকের মধ্যে ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার এক আমেরিকান মেকানিক।

পুরো পার্টিটাই নিখোঁজ হয়ে যায় একেবারে। একটাই মাত্র খবর পাওয়া গেছিল নরওয়ের একটা জাহাজ থেকে। নিরুদ্দেশ জাহাজের মতো একটা জাহাজকে নাকি দেখা গেছিল ১৯২৬ সালের প্রলয়ঙ্কর তুফানের সময়ে। ‘স্ট্র্যাটফোর্ড’ নাম লেখা একটা লাইফবোট পরে পাওয়া গেছিল বিয়োগান্তক দুর্ঘটনার কাছাকাছি জায়গায়। তাতে ছিল একটা লাইফবেল্ট আর একটা লাঠি। এরপর থেকে অনেকদিন আর কোনও খবর না পাওয়া যাওয়ায় ধরে নেওয়া হয়েছিল জাহাজ আর নাবিকদের আর কোনও খবর পাওয়া যাবে না। ভাগ্য যে বিরূপ হয়েছে, সে বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়া গেছিল অদ্ভুত একটা বেতার বার্তা পাওয়ার পর থেকে। সেই সংবাদের বেশির ভাগটাই দুর্বোধ্য হওয়া সত্ত্বেও জাহাজটার কপাল যে পুড়েছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এ ব্যাপারটা আমি বিশদভাবে বলব পরে।

‘স্ট্র্যাটফোর্ড’ জাহাজের অত্যাশ্চর্য অভিযান প্রসঙ্গে বেশ কিছু ব্যাপার সাড়া জাগিয়েছিল সেই সময়ে। একটা ব্যাপার গুজবে ইন্ধন জুগিয়ে গেছিল বিলক্ষণ। প্রফেসর ম্যারাকট নাকি গোটা অভিযানটাকে গোপনে রেখেছিলেন বড়ই কৌতূহলোদ্দীপকভাবে। একটা ব্যাপারে

ওঁর সুনাম ছিল যথেষ্ট। সাংবাদিক মহলকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। বিশ্বাসও করতেন না। অপছন্দের এই ব্যাপারটা চূড়ান্ত মাত্রায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশেষ এই অভিযানের সময়ে। অ্যালবার্ট ডকে তাঁর জাহাজ যখন ছিল, তখন কোনও সাংবাদিককে তিনি খবর দেননি, জাহাজে পা ফেলতেও দেননি কোনও সংবাদ-সন্ধানীকে। জাহাজটায় নাকি গভীর সমুদ্র অভিযানের উপযুক্ত জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে, এই সম্পর্কিত গুজব শোনা গেছিল। জাহাজের গঠনেও যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আনা হচ্ছে, এমন সংবাদও সাংবাদিকদের কানে এসেছিল। জানা গেছিল, জাহাজের গোটা তলার দিকটা নাকি খুলে ফেলা যায়। লয়েড সংবাদমহলের সাংবাদিকরা এ খবর যাচাই করেও নিয়েছিলেন। যদিও সে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের কালঘাম ছুটে গেছিল। তারপরেই ব্যাপারটা সবাই ভুলে গেলেও, জাহাজের পরিণাম নিয়ে যখন ঝড় উঠেছিল সংবাদ জগতে, তখন এই গঠনবৈশিষ্ট্য অসাধারণ সাড়া জাগিয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে।

'স্ট্র্যাটফোর্ড' জাহাজের গোড়ার দিকের কথা এই পর্যন্ত। চারখানা প্রামাণ্য কাগজপত্র থেকে বেশ কিছু খবর জানা গেছে। প্রথম খানা একটা চিঠি। লিখেছিলেন মিস্টার সাইরাস হেডলে, গ্র্যান্ড ক্যানারির রাজধানী থেকে স্যার জেমস ট্যালবটকে— যিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজে। চিঠিখানা লেখা হয়েছিল 'স্ট্যাটফোর্ড' জাহাজ যখন জাহাজঘাটা ছাড়িয়ে টেমস নদী পেরিয়ে জমি ছুঁয়েছিল একবারই— তখন। দ্বিতীয় ডকুমেন্টটা একটা অদ্ভুত বেতার বার্তা, যে প্রসঙ্গ একটু আগেই ছুঁয়ে গেছি। তৃতীয়টা একটা কাচের গোলকের গতিমাপক যন্ত্রের কিছুটা। চতুর্থটাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। একটা আধারের মধ্যে রাখা এমন সব ব্যাপার যা অতীব নির্মম আর কৌতূহলোদ্দীপক প্রহেলিকা। মানব ইতিহাসে যার সমতুল্য আর কিছু হয় না। অতিরঞ্জনের প্রলেপ ছুঁইয়েও যার ধারে কাছে আসা যায় না। মানব ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় রচনা করার পক্ষে যথেষ্ট।

এই ভূমিকা অন্তে আমি এখন পেশ করব মিস্টার হেডলে-র চিঠিখানা, যা আমি পেয়েছি স্যার জেমস ট্যালবট-এর সৌজন্যে, যে চিঠি প্রকাশিত হয়নি এর আগে। চিঠিটার তারিখ পয়লা অক্টোবর, ১৯২৬।

***

মাই ডিয়ার ট্যালবট, এই চিঠি আমি পাঠাচ্ছি পোর্টা ডি লা লাজ থেকে। দিন কয়েকের জন্যে বিশ্রাম নিচ্ছি এখানেই। বিন স্ক্যানলান আমার সবচেয়ে কাছের সহযোগী ছিল অভিযানে। খুবই আমুদে মানুষ। এ কাজে বেশির ভাগ সাহায্য পাচ্ছি তার কাছ থেকেই। আজ সকালে অবশ্য সে আমার কাছে নেই, আছে এক 'ঘাগড়া'। বিল স্ক্যানলান-এর কথা বলার ধরনটাই এই রকম, কথা বলে ইংরেজদের মতো— কিন্তু আমেরিকান কায়দায়। খাঁটি আমেরিকান। ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে যখন থাকি, তখন তার কথাবার্তা বুঝে নিতে হয় ভাবে ভঙ্গীতে। আমি কিন্তু এই চিঠি লিখছি নিখাদ অক্সফোর্ড ঢঙে, ইয়াঙ্কি কায়দায় নয়।
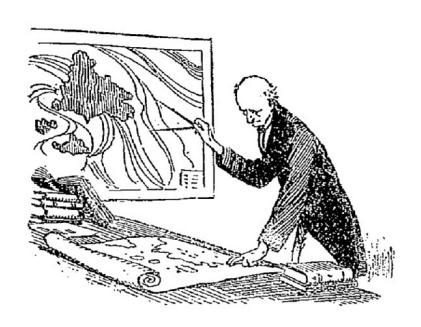
ম্যারাকট-এর সঙ্গে তোমার মোলাকাত হয়েছিল মিটরে-তে। তিনি যে কি পরিমাণ শুষ্ক মানব, তা তোমার অজানা নয়। আগেই তোমাকে বলেছি, এ কাজে আমাকে নেওয়ার সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের খুঁটিনাটি। আগে খোঁজ নিয়েছিলেন জীববিজ্ঞান সংস্থার বৃদ্ধ সমারভিল-এর কাছে। সমুদ্রচর কাঁকড়াদের নিয়ে লেখা আমার নিবন্ধটা তিনি পড়তে দিয়েছিলেন ম্যারাকট-কে। ওষুধ ধরে যায় তখনই। এ রকম একটা মনোমতো ভ্রান্তি যে অতিশয় উপাদেয়, আমাকে তা মানতেই হবে। তবে কি-জানো ম্যারাকট-এর মতো একখানা জীবন্ত মমির সান্নিধ্যে না এলেই বুঝি ভালো হত। অমানবিকভাবে ইনি একলা থাকতে ভালোবাসেন, ডুবে থাকেন নিজের কাজকর্মের মধ্যে। বিল স্ক্যানলান এঁর

সম্বন্ধে অনেক সরস টিপ্পনি কাটলেও মানুষটাকে তারিফ না করে পারবে না, তাঁর নিজস্ব কাজে সুগভীর নিমগ্নতার জন্যে। এঁর দুনিয়ায় আছে শুধু বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের বাইরে নেই কোনও কিছুর অস্তিত্ব। শুনলে হাসবে, আমি যখন ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম নিজেকে তৈরি করার জন্যে কী কী পড়া উচিত, উনি তখন বলেছিলেন, সিরিয়াস পড়াশুনোর জন্যে পড়া দরকার ওঁর নিজের রচনা সংগ্রহ, অবসর বিনোদনের জন্যে পড়তে পারি হেকল-এর 'প্লাঙ্কটন-স্টাডিজ'! শুষ্ক কৌতুকের অবতার এই প্রফেসর ম্যারাকট!

অক্সফোর্ড হাই-য়ের আড্ডাখানায় যতটুকু জেনেছিলাম, তার বেশি এক তিলও বুঝে উঠিনি ভদ্রলোককে! কথাই বলেন না। অস্থিময় শুষ্ক মুখ সবসময়ে খটখট করছে, আন্তরিকতার বাষ্প পর্যন্ত নেই। নাকখানা কৃপাণের মতো যেমন খাড়া, তেমনি লম্বা। দেখলেই মনে হয় যেন কচুকাটা করতে আসছে। চোখদুটো সে তুলনায় ছোট আর কুতকুতে ধূসর বর্ণের, কিন্তু প্রদীপ্ত, খুব কাছাকাছি, ঝোপের মতো ভুরুর ঠিক নিচে। অধরোষ্ঠ নিরতিসীম পাতলা। মুখবিবর-এর যেন দু-খানা কপাট। যে কপাটে খিল তোলা থাকে প্রায় সবসময়ে। দুই গালে দুটো গর্ত আছে বলে মনে হয়— অষ্টপ্রহর চিন্তার ঘোরে থাকার পরিণাম, সাধুসন্তের মতো জীবন যাপন করলে গাল তুবড়ে যায় এই ভাবেই। এমন মুখ যাঁর থাকে, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা যায় না। ভদ্রলোক নিবাস রচনা করেছেন যেন মনের পাহাড়ে, যা মরলোকের বাসিন্দাদের নাগালের বাইরে। মাঝে মাঝে আমার তো মনে হয়, ভদ্রলোক নিশ্চয় একটু পাগলাটে। উদাহরণ স্বরূপ, এই যে অসাধারণ যন্ত্রটা উনি বানিয়েছেন... যাক গে, এ প্রসঙ্গে মুখ খুলব যথা সময়ে। তখনই বুঝবে আমি কী বলতে চাইছি।
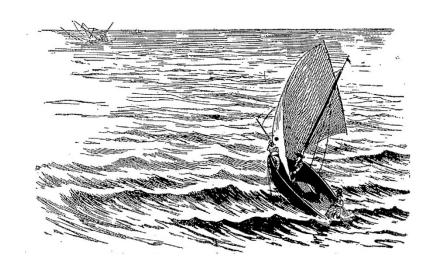
অভিযানের গোড়া থেকেই বলা যাক। 'স্ট্র্যাটফোর্ড' সাগরে পাড়ি দেওয়ার মতো ছোট্ট কিন্তু বেজায় মজবুত জলপোত। যে কাজে যাচ্ছে, সে কাজের উপযুক্ত। বারোশো টন। ডেক মজবুত। স্টিম ইঞ্জিন রীতিমতো শক্তিশালী। আছে অনেক কলকবজা। কিছু চেনা, কিছু বিদঘুটে। আর আছে আরামে থাকবার মতো কোয়ার্টার। বিবিধ যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো ল্যাবরেটরি— আমাদের বিশেষ পরীক্ষানিরীক্ষার উপযোগী।

যাত্রা শুরুর আগে থেকেই এ জাহাজ নাকি একটা প্রহেলিকাপোত— এই সুনাম অর্জন করে ফেলেছিল। অচিরে দেখলাম, এহেন নাম ডাক অকারণে হয়নি। প্রথম প্রথম ষাট ফুট গভীর জল কেটে যেতে হয়েছিল। খামোকা সময় নষ্ট করা হয়েছিল। কেননা এ জাহাজ যে গভীর জলে যাওয়ার উপযোগী। যাচ্ছিলাম তো উত্তর সাগরের দিকে। মামুলি খাওয়ার মাছ, কুকুর-মাছ, স্কুইড, জেলি-মাছ, আর তলদেশের পলিমাটি সমৃদ্ধ তলানি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েনি। তারপর স্কটল্যান্ড ঘুরে এগিয়ে যাওয়ার পর কপাল খুলে গেল। চলে এলাম আফ্রিকার উপকূল আর সেখানকার দ্বীপসমূহের মাঝামাঝি অঞ্চলে। চাঁদ বিহীন এক রজনীতে আর একটু হলে জাহাজের তলা ঘষটে যেত তলদেশে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটেনি।

প্রথম কয়েকটা সপ্তাহে ম্যারাকটের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিবিড় করবার চেষ্টা করেছি। দেখলাম, কাজটা খুব সোজা নয়। প্রথমত, ভদ্রলোক দুনিয়ার সেরা আত্মভোলা আর অন্যমনস্ক মানুষ। লিফট থেকে নেমে বকশিশ আর ভাড়া দিতে যান লিফটম্যানকে, মনে করেন বুঝি ট্যাক্সি থেকে নামলেন। অর্ধেক সময় এমনই চিন্তা নিবিষ্ট থাকেন যে কোথায় আছেন আর

কী করছেন, সে খেয়াল থাকে না। এর ওপরে আছে চূড়ান্ত মাত্রায় গোপনীয়তা রক্ষা করা। বেফাঁস কিছু বলে ফেলার পাত্র নন মোটেই। অনবরত দেখছেন কাগজপত্র আর মানচিত্র, লুকিয়ে ফেলেন আমি কেবিনে ঢুকলেই। অতিশয় গুপ্ত কোনও ব্যাপার আছে নিশ্চয় এই অভিযানে— পয়েন্টগুলো আছে মনের মধ্যে, কাউকে ফাঁস করছেন না এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে যাওয়ার সময়ে। দেখলাম বিল স্ক্যানলানও আমার সঙ্গে একমত এই ব্যাপারে।

একদিন ল্যাবরেটরিতে বসে পরীক্ষা করছিলাম জল কতখানি লবণাক্ত, বিল স্ক্যানলান এসে বললে, 'এই যে মিস্টার হেডলে, লোকটার মতলব কী বলুন তো? কী করতে চলেছেন?'

আমি বললাম, 'আগে সবাই যা করেছে, তাছাড়া আর কী হতে পারে? নতুন নতুন মাছের ফর্দ, আর জল কতখানি গভীর— ব্যাস, হয়ে গেল।'

'মোটেই না। ফের ভাবুন মশায়, ফের ভাবুন। যেমন, আমাকে আনা হল কেন?'

'কলকবজা যদি বিগড়োয়, আপনি দেখবেন— তাই।'

'আপনার মুন্ডু! কলকবজা দেখবার ভার তো স্কচ ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকলারেন-এর ওপর। আসুন তাহলে, দেখানো যাক আপনাকে।' এই বলে, পকেট থেকে একটা চাবি বের করেছিল বিল স্ক্যানলান। খুলেছিল ল্যাবরেটরির পেছন দিকের একটা দরজা। নেমে গেছিল একটা মই বেয়ে খোলের মধ্যে। সেখানে দেখেছিলাম, বিরাট প্যাকিং কেসের মধ্যে রয়েছে চারখানা খুব চকচকে জিনিস। ইস্পাতের পাত। চারপাশে সারবন্দি নাট-বল্টুর ছেঁদা। প্রত্যেকটা স্টিল প্লেট লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় দশ ফুট। আধ ইঞ্চি পুরু। মাঝখানে একটা করে দেড় ফুট ব্যাসের গোল ফোকর।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এ আবার কী?'
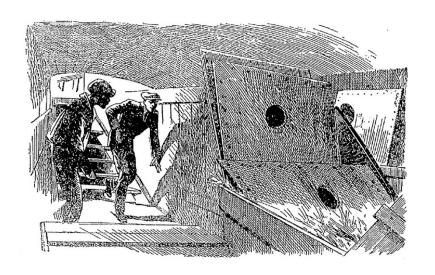
সকৌতুকে তাকিয়ে থেকে অট্টহাস্য করেছিল বিল স্ক্যানলান। বলেছিল, ‘এ-ই আমার খোকা। এর জন্যেই আনা হয়েছে আমাকে। মেঝেটাও ইস্পাতের। ছাদটাও ইস্পাতের। একটু বেঁকা, যাতে দড়ি বা ইস্পাতের শেকল লাগানো যায়। এবার দেখুন জাহাজের তলার দিকটা।’

দেখলাম, খোলের নিচে রয়েছে একটা চৌকোনা কাঠের মঞ্চ— চারপাশে বেরিয়ে রয়েছে স্ক্রু-র মাথা। তার মানে, খোলের এই চৌকোনা তলদেশ খুলে আনা যায়। স্ক্যানলান বললে, ‘এর নিচে আর একটা তলা আছে। তার মানে, ম্যারাকট মশায়ের ফন্দি অনেক। সযত্নে রেখেছেন গোপনে, কাকপক্ষীকেও জানতে দিতে চান না। আমাদেরকেও নয়। আমার তো মনে হয়, ইস্পাতের একখানা ঘর তৈরি করার মতলব আছে ওঁর মগজের মধ্যে। জানলাগুলো স্টোর করে রেখেছেন এইখানে। তারপর জাহাজের তলা দিয়ে নামিয়ে দেবেন জলের মধ্যে। এইখানে রেখেছেন ইলেকট্রিক সার্চ লাইট। গোল পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্রের তলায় আলো ফেলে দেখবেন কী আছে সাগরের একদম নিচে।’

আমি বললাম, ‘সেই মতলব থাকলে জাহাজের তলায় একটা ক্রিস্টাল চাদর লাগিয়ে নিলেই পারতেন।’

বলেছেন ঠিকই, মাথা চুলকেছিল বিল স্ক্যানলান, ‘মাথামুন্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না। বুঝেছি শুধু একটা ব্যাপার। উনি যা বলবেন, মুখ বুজে তা করে যেতে হবে। তা সে যতই নিরেট বোকামির কাজ হোক না কেন। এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি। আমিও তক্কে তক্কে আছি। মতলবটা কী, জানতেই হবে।’

এইভাবেই রহস্যের একটু আভাস পেয়েছিলাম সেদিন। এরপরে যেতে হয়েছিল খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে। জুবা অন্তরীপের উত্তর পশ্চিমের গভীর জলে কিছু কাজ করতে হয়েছিল। জায়গাটা মহীঢাল এর ঠিক বাইরে। টেম্পারেচার আর জলের লবণতা মাপতে হয়েছিল। কাজটার মধ্যে ছিল খেলোয়াড়ি উদ্যম। কখনও যেতে হয়েছে গভীর সমুদ্রে প্রায় সিকি মাইল পর্যন্ত, কখনও আধ মাইল, জালে টেনে তোলা হয়েছে বিস্তর মাছ এবং যেন বহু মহাদেশীয় অনেক কিছু। কখনও তুলে এনেছি আধটনের মতো গোলাপি জেলি। প্রাণের মূল উপাদান, কখনও স্বচ্ছ কাদার মধ্যেকার লক্ষ লক্ষ খুদে খুদে গোলক। সমুদ্রের তলদেশের এই অগণন বৈচিত্র্য নিয়ে তোমার বিরক্তি উৎপাদন ঘটানোর ইচ্ছে আমার নেই। তবে, গোড়া থেকেই আমার মনে হয়েছিল এই যে এত কাণ্ড করে চলেছেন ম্যারাকট ওঁর মূল কাজ এ সবের মধ্যে নেই। মিশরীয় মমির মগজে আছে অন্য মতলব। এ যেন মহড়া চলছে— আসল কাজের আগের রিহার্সাল।

এই পর্যন্ত লেখবার পর আমাকে একবার ডাঙায় নামতে হয়েছিল হাত-পা টান টান করে নেওয়ার অভিলাষ নিয়ে। কেননা, যাত্রা শুরু হবে পরের দিন সকালেই। ম্যারাকট আর বিল স্ক্যানলানও ছিলেন আমার সঙ্গে। জেটিতে যারা জড়ো হয়ে সদা মশগুল থাকে, ছুরি ছোরা তাদের নিত্য সঙ্গী। ম্যারাকট একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া নিয়ে দ্বীপে টহল দিতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু পকেটে যে পয়সা নেই, তা মনে ছিল না। হাঙ্গামাটা লেগেছিল তারপরেই। বিল স্ক্যানলান দাঙ্গা শুরু করে দিতেই। ভাগ্যিস আমার কাছে কিছু ডলার ছিল, তা-ই দিয়ে ড্রাইভারকে খোশমেজাজে নিয়ে এসেছিলাম। ম্যারাকট এই ঘটনার পর অনেকটা মানবিক হয়ে গেলেন। জাহাজে ফিরে আসার পর আমাকে ওঁর ছোট্ট কেবিনে ডেকে পাঠিয়ে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, ‘মিস্টার হেডলে, আপনি তো আইবুড়ো?’

আমি বললাম, 'তা বটে।'

'বিয়ে যখন করেননি, আপনি ঝাড়া হাত-পা মানুষ, আপনার রোজগারের মুখ চেয়ে কেউ বসে নেই?'

'কেউ নেই।'

চমৎকার। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য বলিনি বিশেষ কারণে। পাঁচকান হোক, তা চাই না। গুপ্ত অভিযান গুপ্ত থাকুক। জানাজানি হলেই বাগড়া পড়ত। বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গোপনে রাখতে হয়। দক্ষিণমেরু অভিযান এর আগে যাঁরা করেছেন, তাঁরা ঢাক পিটেছিলেন বলেই ব্যর্থ হয়েছেন। আমি ঢাক না পিটে দক্ষিণ মেরুর দিকেই চলেছি। কিন্তু মুখে চাবি দিয়ে রেখেছি। কিন্তু গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারের দোড়গোড়ায় এসে যখন দাঁড়িয়েছি, তখন একটু মুখ খোলা যেতে পারে। বিশেষ করে যখন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী আমার প্ল্যান চুরি করতে পারেনি। কাল শুরু হবে আমাদের আসল অ্যাডভেঞ্চার।'

'কী সেই অ্যাডভেঞ্চার?' আমার প্রশ্ন।

বিশীর্ণ তাপসিক মুখে উন্মত্ত উৎসাহের রোসনাই জাগ্রত করে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন ম্যারাকট।

বললেন, 'আমাদের লক্ষ্য— আটলান্টিকের তলদেশ।'

শুনে তো আমার দম আটকে এসেছিল। আটকে আসছে নিশ্চয় তোমারও। হাতে যদি একটু সময় থাকত, শেষ ডাকে এই খবরটা লিখে পাঠিয়ে দিতাম।

ম্যারাকট বললেন, 'যা খুশি এখন লিখতে পারেন। কেননা, আপনার রিপোর্ট ইংল্যান্ডে যখন পৌঁছবে, তখন আমরা সাগরের তলায়।'

কথাটার মধ্যে ঠিকরে ঠিকরে গেল ভদ্রলোকের শুষ্ক কৌতুকবোধ।

বললেন, 'বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা একটা নতুন অধ্যায় জুড়তে চলেছি। প্রথমেই বলে রাখি, সাগরের তলায় ভীষণ চাপ নিয়ে এখনকার মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল। অন্য অন্য কারণে এই জল চাপ কাটাকুটি হয়ে যায়— সেই কারণগুলো কী, এই মুহূর্তে তা বলতে চাই না। এই একটা ব্যাপার মিটিয়ে নেওয়ার পর একটা প্রশ্ন রাখছি আপনার কাছে। এক মাইল জলের নিচে কতখানি চাপ আপনি আশা করেন?'

'প্রতি বর্গইঞ্চিতে এক টনের একটু কম। এ ব্যাপার তো আগেই দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'যা দেখানো হয়েছে, তা ভুল। যে পুরোধা ব্যক্তি এমন মত জাহির করেছেন, তিনি ভ্রান্ত। ইয়ং ম্যান, নিজের মাথা খাটান। গত একমাস ধরে খুবই সূক্ষ্ম আকারের কিছু জলচর প্রাণীদের আপনি জাল ফেলে ধরেছেন— এতই সূক্ষ্ম যে জাল থেকে ছাড়াতে বেগ পেয়েছেন। জাল থেকে ছাড়িয়ে জলের ট্যাঙ্কে ফেলতে গিয়ে আপনার হাতেই তাদের সূক্ষ্ম অবয়ব বিকৃত হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'জলের চাপ আর ওদের ভেতরকার চাপ একই রকম বলে জলের মধ্যে থাকার দরুণ দেহ বিকৃত হয়নি, চিঁড়ে চ্যাপটা হয়নি।'

শীর্ণ মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যারাকট বললেন, 'এ তো শুধু কথার মারপ্যাঁচ! আপনার জালে গোল গোল মাছও উঠেছে। নয় কি? জলের প্রচন্ড চাপে তো তাদের চ্যাপটা হয়ে টিকে থাকা উচিত ছিল?'

'ডুবুরিদের অভিজ্ঞতাটা হিসেবের মধ্যে ধরছেন না কেন?'

'সেটা একটা পয়েন্ট বটে। তারা যথেষ্ট চাপ অনুভব করেছে শরীরের খুব স্পর্শকাতর প্রত্যঙ্গ দিয়ে যেমন— কানের ভেতর দিক। কিন্তু আমি যে প্ল্যান করেছি, তাতে আমরা কোনওরকম চাপের আওতায় যাব না। আমরা নেমে যাব একটা ইস্পাতের খাঁচার মধ্যে থেকে, যে খাঁচার চারদিকে থাকবে চারটে ক্রিস্টাল জানলা— চারপাশ দেখবার জন্যে।

জলের চাপ যদি প্রচণ্ড হয়, তাহলেও দেড় ইঞ্চি পুরু ডাবল নিকেল ইস্পাত তা রুখে দেবে— ভেতরে থাকব আমরা। গায়ে আঁচ লাগবে না। ন্যাসো-র উইলিয়ামসন ব্রাদার্স এই এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনার তা অজানা নয়। আর যদি বলেন, ভুল আছে আমার হিসেবে, তাতে আপনার বয়ে গেল— কেননা, আপনার রোজগারের ওপর নির্ভর করে নেই কেউই। মরব একটা গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে। এখন যদি মনে করেন, সরে দাঁড়াতে পারেন— আমি একাই যাব।'

এ যে দেখছি উন্মাদের কাণ্ডকারখানা! সব শুনেও কিন্তু সটাসট প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। আর একটু ভাবা দরকার। তাই সময় নিলাম।

বললাম, 'যাওয়ার প্ল্যানটা কী?'

টেবিলের ওপর একটা চার্ট পিন দিয়ে আটকানো ছিল। ম্যারাকট তার ওপর কম্পাস রেখে যে জায়গাটা দেখালেন, সেটা ক্যানারিস-এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।

বললেন, 'গত বছর এই জায়গাটার জল মেপেছিলাম। একটা বিষম গভীর গর্ত আছে— ঠিক এইখানে। পঁচিশ হাজার ফুট পর্যন্ত পেয়েছিলাম। প্রথম রিপোর্ট পাঠাই আমি। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতের ম্যাপে জায়গাটার নামকরণ হবে 'ম্যারাকট ডিপ।'

'সে কী! এই রকম একটা পাতালে আপনি নামতে চান নাকি?'

শুষ্ক হেসে বললেন ম্যারাকট, 'আরে না। আধমাইলের বেশি তো যাবে না আমাদের বাতাসের নল অথবা নিচে নামানোর শেকল। এমন একটা গভীর নিতল খাদ সৃষ্টি করেছে আগ্নেয়গিরির শক্তি— বহু বছর আগে... নিশ্চয় খাঁজ খোঁদল সরু উপত্যকা আছে... যে জায়গাগুলো জলপৃষ্ঠ থেকে তিনশো ফ্যাদম গভীরতার গভীরে নিশ্চয় নেই।'

'তিনশো ফ্যাদম! এক মাইলের তিন ভাগের একভাগ।'

'আরে হ্যাঁ, মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ মাইল। আমার এখনকার ইচ্ছে অনুযায়ী, সাগরতলের এই গভীরতায় নেমে যাব প্রেসার-প্রুফ খুদে পর্যবেক্ষণ স্টেশনের মধ্যে ঢুকে থেকে— নেমে যাব সাগরতলের উপত্যকায়। যা পারি, তা-ই দেখে নেব। একটা কথা বলার নল থাকবে জাহাজ পর্যন্ত। নির্দেশ-টির্দেশ দেব সেই নলের মধ্যে দিয়ে। কোনও ঝামেলা নেই সে ব্যাপারে। টেনে তোলার ইচ্ছে যখন হবে, নলের মধ্যে দিয়ে তা বলে দেব।'

'বাতাস?'

'পাম্পে করে নামিয়ে দেওয়া হবে নিচে।'

'কিন্তু সেখানে যে আলকাতরার মতো অন্ধকার।'

'কথাটা নিঃসন্দেহে খাঁটি। জেনেভা লেক-য়ে ফোল আর সারাসিন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন, ওই রকম গভীরতায় অতিবেগুনি রশ্মি পর্যন্ত পৌঁছয় না। তাতে কী এসে গেল? জাহাজের ইঞ্জিন পাওয়ার ফুল ইলেকট্রিক আলো সাপ্লাই দেবে, সেই সঙ্গে বাড়তি জোগানদার থাকবে ছ-টা দু-ভোল্টের হেলেসেন্স ড্রাই ব্যাটারি। এর সঙ্গে থাকবে লুকাম আর্মি সিগন্যালিং ল্যাম্প— যে রিফ্লেকটর নড়ানো সরানো যাবে যদি দরকার হয়। আছে আর কোনও অসুবিধে?'

'বাতাসের নল যদি জট পাকিয়ে গিঁট বেধে যায়?'

'যাবে না। রিজার্ভ বাতাস হিসেবে থাকবে টিউবের মধ্যে চেপে ঢোকানো বাতাস, যাতে চলে যাবে চব্বিশ ঘণ্টা। সন্তুষ্ট তো? আসছেন অসম্ভবের এই অভিযানে?'

চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া কি সম্ভব? ব্রেনকে কাজ করতে হয়েছে ঝটিকা বেগে। কল্পনার ফানুসে মগজ ভরে গেছে। মনের ছবিতে দেখতে পেলাম কালো বাক্স নেমে গেছে আদিম গভীরতায়, যে বাতাসে দু-বার শ্বাস নেওয়া হয়ে গেছে— সেই বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস আর চলছে না; তারপর দেখতে পেলাম— দেওয়াল তুবড়ে দুমড়ে মুচড়ে ঢুকে আসছে ভেতর দিকে, জয়েন্টগুলো খুলে গেছে— হু হু করে জল ঢুকছে ভেতরে— পাশ থেকে, ওপর থেকে, নিচ থেকে; মৃত্যু হচ্ছে ধীরে ধীরে; বড় ভয়ানক বড় ধীরস্থির মৃত্যু। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম বৃদ্ধ প্রফেসর প্রদীপ্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে থেকে বিজ্ঞানের প্রগতির জন্যে শহীদের মতো মৃত্যু বরণ করছেন। তাতেই ওষুধ ধরে গেল। তাঁর চোখের আগুনে আমি প্রদীপ্ত হয়ে উঠলাম। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিলাম।

'ডক্টর, শেষ পর্যন্ত আমি আছি আপনার সঙ্গে।'

'জানতাম আপনি থাকবেন। আপনার উলটোপালটা জ্ঞানের জন্যে আপনাকে দলে টানিনি।' একটু মুচকি হেসে— 'সমুদ্রচর কাঁকড়া নিয়ে আপনার নিবন্ধের খাতিরেও নয়। এ ছাড়াও অন্যান্য কিছু গুণপনা দরকার— আনুগত্য আর সাহস।'

তেঁতো প্রসঙ্গ টেনে এনেও মিছরি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন প্রফেসর। আমার ভবিষ্যৎ রাখলেন নিজের মুঠোর মধ্যে, বাকি জীবনটা ধ্বংস হয় হোক, তা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। শেষ বোট জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তীরের দিকে, নিয়ে যাচ্ছে চিঠিপত্র। চাইছে সবার কাছে। তাই এই চিঠি তড়িঘড়ি লিখে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। মাই ডিয়ার ট্যালবট, তোমার কাছে আমার এই চিঠিই বোধহয় শেষ চিঠি। আর যদি আবার চিঠি পাও তাহলে জানবে সে চিঠি হবে পড়বার মতো চিঠি। যদি আর চিঠি না পাও তাহলে একটা ভাসমান সমাধি ভাসিয়ে দিও ক্যানারিস-এর দক্ষিণে কোথাও, তাতে যেন লেখা থাকে :

'এইখানে, অথবা এই জায়গার ধারে কাছে কোথাও, রয়েছে বন্ধুবর সাইরাস জে. হেডলে-র মাছে ঠোকরানো দেহাবশেষ'।

***

এই কেসে দ্বিতীয় নথি যেটা এসেছিল, সেটা অতিশয় দুর্বোধ্য বেতার বার্তা— বেশ কয়েকটা জাহাজের মারফত। রয়্যাল ডাক জাহাজ আরোরা ছিল এই জাহাজগুলোর অন্যতম। সেটা পাওয়া গেছিল ১৯২৬ সালের তেসরা অক্টোবর বিকেল ৩ টের সময়ে। তাহলে এই বেতার বার্তা পাঠানো হয়েছিল নিশ্চয় 'গ্র্যান্ড ক্যানারি' ছেড়ে 'স্ট্র্যাটফোর্ড' জাহাজ রওনা হওয়ার দু-দিন পরে, আগের চিঠির তারিখ অনুসারে, সময় আর তারিখ মোটামুটিভাবে মিলে যাচ্ছে নরওয়ে জাহাজ থেকে দেখা একটা দৃশ্যের সঙ্গে। বিশেষ সেই স্টিমার সাইক্লোনের কবলে পড়েছিল 'পোর্টা ডি লা লাজ' থেকে দু-শো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা জায়গায়। বার্তায় যা লেখাছিল, তা এই :

'রশ্মির শেষের দিকে ফেটে উড়ে গেল। ভয় হচ্ছে অবস্থা সুবিধের নয়। ম্যারাকট-কে এর মধ্যেই হারিয়েছি, হেডলে আর স্ক্যানলানকেও। পরিস্থিতি দুর্বোধ্য। হেডলে-র রুমাল গভীর সমুদ্রের তলদেশ মাপবার তারে। ঈশ্বর সহায়! এস এস স্ট্র্যাটফোর্ড।'

কপাল পোড়া জাহাজ থেকে সর্বশেষ পাওয়া দুর্বোধ্য বার্তা এইটাই। বার্তার কিছুটা অংশ এতই অদ্ভুত যে অপারেটরের মাথা বিগড়েছেমনে করে আমল দেওয়া হয়নি প্রলাপের মতো মেসেজটাকে। তবে, জাহাজটার কপালে যে অশেষ দুর্গতি ঘটেছে, এ ব্যাপারে আর সন্দেহ থাকেনি। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল খবরটা। পাওয়া গেছে একটা স্ফটিক গোলক। গোলকের মধ্যে যে বার্তা ছিল, তার কোনও মাথামুন্ডু নাকি হয় না। 'আরাবেল্লা নোলেস' জাহাজের মাস্টার অ্যামোস গ্রিন জাহাজের লগ বুকে ঠিক যে রকমটি লিখেছিলেন, আমি তা হুবহু তুলে দিচ্ছি। এ জাহাজ কয়লা নিয়ে যাচ্ছিল কারডিফ থেকে :

'বুধবার, ৫ জানুয়ারি, ১৯২৭। অক্ষাংশ ২৭.১৪, দ্রাঘিমা ২৮ পশ্চিম। আবহাওয়া প্রশান্ত। নীল আকাশে হালকা মেঘ নিচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সমুদ্র কাচের মতন। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়তেই মধ্য অবস্থানের ফার্স্ট অফিসার জানালেন, একটা চকচকে জিনিস দেখেছেন লাফিয়ে উঠল সমুদ্রের ওপর অনেকখানি উঁচুতে... তারপর ভেসে রইল জলের ওপর। প্রথমে ভেবেছিলেন, অদ্ভুত কোনও মাছ। দূরবীন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার পর বুঝলেন, জিনিসটা একটা রুপোলি গোলক, অথবা বর্তুল, খুব হালকা, তাই ঠিক যেন জলের ওপর পড়ে রয়েছে— ভাসছে, একথা বলা যায় না। আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। গিয়ে দেখলাম জিনিসটাকে। ফুটবলের মতো বড়। আধমাইল দূর থেকে দেখছি, তবুও ঝকঝক

চকচক করছে। জাহাজ থামানোর হুকুম দিলাম। সেকেন্ড মেট-কে বললাম কোয়ার্টার বোট নিয়ে গিয়ে গোলকটাকে তুলে আনতে। সে এনে দিল জাহাজের ওপর।

'খুঁটিয়ে দেখলাম। খুব মজবুত কাচ দিয়ে তৈরি গোলক। ভেতরে ঠাসা আছে এমন কিছু যার জন্যে শূন্যে ছেড়ে দিলে গ্যাসভরতি বাচ্চাদের বেলুনের মতো ভেসে থাকে কিছুক্ষণ। স্বচ্ছ। ভেতরে পাকানো অবস্থায় কাগজ রয়েছে। ভীষণ মজবুত গোলক। মানে, গোলক যা দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেই পদার্থ। ভাঙতে বেগ পেতে হয়েছিল। তারপরেই তো ভেতরকার কাগজপত্র বাইরে আনা গেছে। হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে চিড় ধরানো যায়নি। চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনের মধ্যে দিয়ে তবে ভাঙতে পেরেছেন, ভেতরকার রোলকরা কাগজ বাইরে আনতে পেরেছেন। তারপরেই সেই গোলক স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় জিনিসটার নমুনা সংগ্রহে রাখা গেল না। তবে কাগজগুলো পেয়েছি। পড়ে বুঝেছি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ঠিক করেছি, প্লেট রিভার-এ পৌঁছে ব্রিটিশ দূতাবাসে দেব। সমুদ্রে টহল দিচ্ছি পঁয়ত্রিশ বছর, এমন অদ্ভুত জিনিস কখনও পাইনি। আমার জাহাজি সাঙ্গপাঙ্গরা একমত আমার সঙ্গে। আমার চাইতে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জন্যে তোলা থাক গোটা ব্যাপারটা।

সাইরাস জে হেডলে-র বক্তব্য এইবার তুলে ধরা যাক হুবহু :

লিখছি কাকে? গোটা দুনিয়াটাকে সম্বোধন করা মানে সেটা হয়ে যাবে ভাসা ভাসা সম্বোধন। তার চেয়ে বরং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার জেমস ট্যালবটকে উদ্দেশ করা যাক। একটাই কারণে। আমার সর্বশেষ পত্র গেছিল তো তাঁর কাছেই। এই চিঠি সেক্ষেত্রে সেই চিঠির ক্রমশ ধারাবাহিকতা। জানি না, তাঁর কাছে পৌঁছোবে কি না। গোলকটা সূর্যের মুখ নাও দেখতে পারে। যদিও বা দেখে একটামাত্র দিনের জন্যে। তারপরেই পাশ দিয়ে যাওয়া কোনও এক হাঙরের পেটে প্রস্থান করতে পারে, অথবা হয়তো ঢেউয়ে নেচে নেচেই যেতে পারে কোনও নাবিকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। তাহলেও চেষ্টা করতে দোষ কী। ম্যারাকট মশায় নিজেও একটা ছাড়তে চলেছেন। দুটোর একটা যদি পৃথিবীর মানুষের হাতে পৌঁছোয়, তাহলেই তো সবাই জেনে যাবে আমাদের ওয়ান্ডারফুল কাহিনি। বিশ্বাস না করতে পারে, তাহলেও গোলক কী দিয়ে নির্মিত, এই নিয়েই তো ভাবনাচিন্তা গবেষণা শুরু হয়ে যাবে। স্ফটিক গোলক, ভেতরে লেভিজেন গ্যাস। এই থেকেই বুঝবে, ব্যাপারটা মামুলি নয়। ট্যালবট, তুমি অন্তত এই বিবৃতিকে কপোলকল্পিত বিবেচনায় ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করবে না।

এত কাণ্ডকারখানার সূচনাটা কী, তা যদি কেউ জানতে চান, অথবা কী করতে চাই আমরা এই বিষয়ে যদি কৌতূহলী হন, তাহলে যেন গত বছরের পয়লা অক্টোবর তোমাকে যা লিখেছিলাম পোর্টা ডি লা লুজ থেকে রওনা হওয়ার আগের রাতে, তাতে দয়া করে একটু চোখ বুলিয়ে নাও! কপালে কী দুর্গতি আছে, তা যদি ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারতাম সেই রাতে, তাহলে নৌকো চুরি করে নির্ঘাত চম্পট দিতাম জাহাজ থেকে। বলছি বটে, কিন্তু তারপরেই সিদ্ধান্ত নিতাম অন্য রকমের। থাকা যাক ডক্টরের পাশে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত। চম্পট দেওয়ার প্রাথমিক ঝোঁক কেটে গেলে ঠিক তা-ই করতাম। এই বিষয়ে আমার মনে নেই তিল মাত্র সংশয়।

যাক গে, গ্র্যান্ড ক্যানারি থেকে রওনা হওয়ার পর থেকে আমার অভিজ্ঞতাপর্ব লিপিবদ্ধ করে যাওয়া যাক।

বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার আগুনে যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন বৃদ্ধ ম্যারাকট মশায়। অবশেষে এসেছে কাজের কাজ করার সময়— বৃদ্ধের ভেতরকার মিইয়ে থাকা এনার্জিতে যেন ফুলকি ধরে গেল নিমেষের মধ্যে। চকিত চমকে গোটা জাহাজটাকে এনে ফেললেন মুঠোর মধ্যে। জাহাজের সব কিছু আর সব মানুষকে নুইয়ে আনলেন নিজের ইচ্ছের ছকে। সদা অন্যমনস্ক আত্মভোলা সেই মানুষটা যেন নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সে জায়গায় এসে গেল একটা মানুষ বৈদ্যুতিক মেশিন, ফেটে ফেটে কেঁপে কেঁপে গেলেন প্রচন্ড মনের জোরে, ভেতরকার বিশাল চালিকাশক্তির দৌলতে। লণ্ঠনের শিখার মতো জ্বলে জ্বলে গেল তাঁর দুই চক্ষু চশমার কাচের আড়ালে। বিদ্যুৎ শিখার মতোই যেন একই সময়ে হাজির রইলেন সব জায়গায়, কখনও চার্ট ফেলে দূরত্ব মেপে গেলেন, কখনও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে হিসেবের বচসা চালিয়ে গেলেন, বিল স্ক্যানলানকে মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকতে দিলেন না, আমাকে শখানেক কাজে ভিড়িয়ে দিলেন— সব কিছুর পেছনে রইল সুনির্দিষ্ট একটা প্রক্রিয়া— বিশেষ একটা শেষ। ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত জ্ঞানের বহর দেখিয়ে গেলেন, যন্ত্রপাতির ব্যাপারেও দেখা গেল তার জ্ঞান হেলাফেলার ব্যাপার নয়, বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে গেলেন স্ক্যানলান-এর সঙ্গে যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত ব্যাপারে। নিজেই তদারকি চালিয়ে জোড়া লাগাতে লাগলেন কলকবজার টুকরো টাকরা অংশ।

দ্বিতীয় দিবসের প্রত্যুষে বিল বললে আমাকে, 'আসুন, আসুন, দেখে যান ডক্টর কী জিনিস বানিয়েছেন।'
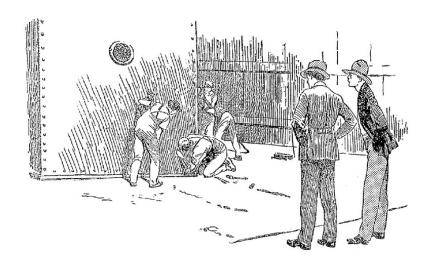
মনে হল যেন তাকিয়ে আছি আমার নিজের কফিনের দিকে। তা সত্ত্বেও মানতে হল, সমাধি পিঞ্জর হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়। মেঝের সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হয়েছে চারদিকের চারটে ইস্পাতের দেওয়াল। প্রত্যেক দেওয়ালের মাঝে রয়েছে গোলাকৃতি পোর্টহোল বাতায়ন। মাথার ওপরকার ইস্পাতের চাদরে রয়েছে একটা চোরা দরজা— শোয়ানো দরজা— নিচে নেমে ভেতরে ঢোকবার জন্যে। আর একটা শোয়ানো দরজা রয়েছে পায়ের তলার মেঝেতে। ইস্পাতের এই খাঁচাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মাথার ওপরকার একটা খুব সরু, কিন্তু শক্তিশালী ইস্পাতের জাহাজি কাছি দিয়ে, যা জড়ানো রয়েছে একটা ড্রামে, খুলে বের করে দেওয়া যাবে অথবা গুটিয়ে টেনে নেওয়া যাবে একটা পাওয়ারফুল ইঞ্জিন দিয়ে— যে ইঞ্জিন থাকে গভীর সমুদ্রের জলযানে। স্টিলের এই কাছি লম্বায় আধ মাইল, রয়েছে ডেকের ওপরে রাখা মস্ত কাটিমে জড়ানো অবস্থায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের রবারের নলও সেইরকম লম্বা, টেলিফোনের তার লাগানো রয়েছে এই কাছির সঙ্গে, রয়েছে ইলেকট্রিক আলোর তার যার মধ্যে দিয়ে জাহাজ ব্যাটারি থেকে কারেন্ট যাবে ইস্পাতের খাঁচার মধ্যে, এ ছাড়াও খাঁচার মধ্যে রয়েছে নিজস্ব স্বনির্ভর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা।

সেইদিনই সন্ধের সময়ে বন্ধ করে দেওয়া হল সমস্ত ইঞ্জিন। দিগন্তে দেখা গেল ঘন কালো মেঘ ঝড়ের সংকেত। নজরের সীমার মধ্যে ছিল একটাই জাহাজ— মাস্তুলে উড়ছিল নরওয়ে পতাকা, পাল গুটিয়ে নিল প্রভঞ্জনের সংকেত পেয়ে। সেই মুহূর্তে চারদিক ছিল

বিলকুল প্রসন্ন অবস্থায়। গভীর নীল সমুদ্রে ছন্দে ছন্দে দুলে যাচ্ছিল ‘স্ট্র্যাটফোর্ড’ জাহাজ, বাণিজ্য বাতাসের দৌলতে মাঝেসাঝে এদিকে সেদিকে দেখা যাচ্ছিল সাদা ফেনা। আমার ল্যাবরেটরিতে এল বিল স্ক্যানলান। বেশ উত্তেজিত অবস্থায়। ভাবভঙ্গীতে ওর সেই স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া লক্ষণ দেখতে পেলাম না।

বললে, ‘মিস্টার হেডলে, খাঁচাটাকে জাহাজের খোলে নামিয়ে দেওয়া হল এখুনি! বস কি এর মধ্যে ঢুকে পাতাল দেখতে যাবেন নাকি? কী মনে হয় আপনার?’

‘যাবেন বইকী। আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।’

‘পোকা আছে আপনাদের দু-জনেরই মাথার মধ্যে। এ রকম কাণ্ড কেউ করে? আপনারা শুধু দু-জনেই কেল্লা মেরে দেবেন, সেটি কিন্তু হতে দিচ্ছি না।’

‘এটা তো আপনার ব্যাপার নয়, বিল।’

‘কিন্তু আমি যে মনে করি, ব্যাপারটা আমারও বটে। আপনারা শুধু দু-জনে হিরো হবেন, সেটি হতে দিচ্ছি না। কলকবজা ঠিকঠাক আছে কি না, দেখতে পাঠাল মেরিব্যাঙ্ক। জলের তলাতেও ঠিকঠাক চলছে কি না, সেটাও তো দেখতে হবে আমাকে। ইস্পাতের কলকবজা যেখানে, বিল স্ক্যানলান সেখানে। আমার সঙ্গে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের মাথায় যদি পোকা নড়ে, তা সত্ত্বেও আমি আছি সঙ্গে।

এমন লোকের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। তাই আমাদের ছোট্ট সুইসাইড ক্লাবে ভিড়ে গেল আর একজন। রইলাম শুধু হুকুমের অপেক্ষায়।

ফিটিং করতেই গেল সারারাত। পরের দিন সাতসকালে প্রাতরাশ সেরে নিয়েই ঢুকে গেলাম খাঁচার মধ্যে। অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে তৈরি হয়ে। জাহাজের খোলের নিচের যে দিকটা খুলে ফেলা যায়, ইস্পাতের খাঁচাটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানে। ওপরকার মেঝেতে শোয়ানো দরজা দিয়ে আমরা ঢুকলাম ভেতরে। তিনজনে ঢুকে যেতেই ক্যাপ্টেন হোয়ি আমাদের সঙ্গে অতিশয় কষ্টের সঙ্গে করমর্দন সেরে নিয়ে শোয়ানো দরজা বন্ধ করে দিলেন ওপর থেকে। স্ক্রু টাইট দেওয়া হল তার পরেই। খাঁচা নিচে নামিয়ে দেওয়া হল কয়েক ফুট, শাটার টেনে বন্ধ করে দেওয়া হল মাথার ওপর, কতখানি জল ঢুকে পড়েছে তা মেপে নিয়ে পরীক্ষা করা হলে সমুদ্রের উপযুক্ত আমরা কতটা। খাঁচা উতরে গেল সেই পরীক্ষায়। জল চুঁইয়ে ঢুকল না কোনও দিক দিয়েই। তারপরেই ঢিলে করে দেওয়া হলখোলের নিচের অংশ। আমরা ভেসে রইলাম জাহাজের নিচে জলের মধ্যে।

ঘরটা বাস্তবিকই বেশ ছোটখাটো আরামপ্রদ কক্ষ। অবাক হয়েছিলাম নির্মাণকর্তার অপূর্ব চাতুর্য আর বুদ্ধির দূরদৃষ্টি দেখে। আগে থেকেই ভেবেচিন্তে মেপেজুপে যেখানে যেটি দরকার সেখানে সেটি স্থাপন করা হয়েছে। বেশ গুছোনো ব্রেনের গুছোনো কাজ। বৈদ্যুতিক আলো তখনও চালানো না হলেও আধা-নিরক্ষীয় সূর্যের চাপা আলো গাঢ় সবুজ সমুদ্র জল ভেদ করে ইস্পাত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করছিল চার দেওয়ালের চারটে গোল গবাক্ষ দিয়ে। ছোট ছোট কিছু মাছ সন্তরণের কায়দা দেখিয়ে যাচ্ছিল এ পাশে সে পাশে— সবুজ পটভূমিকায় রুপোলি রেখার মতন। ভেতরে, চৌকোনা ঘরের চারদিকের দেওয়াল জুড়ে পাতা ছিল সোফাসেট, গভীর সমুদ্রের গভীরতা মাপবার ব্যাথিমেট্রিক ডায়াল, একটা থার্মোমিটার, আরও অনেক যন্ত্রপাতি— সারবন্দি সাজানো চার দেওয়ালের গা ঘেঁষে সোফা সেটের ঠিক মাথার ওপরে। সোফার নিচ দিয়ে গেছে সারবন্দি খানকয়েক পাইপ চেপে রাখা বাতাসের রিজার্ভ সাপ্লাই-এর জন্যে— দৈবাৎ যদি নলের মধ্যে দিয়ে বাতাস আসা বন্ধ হয়ে যায়, সেই দূরবস্থার প্রতিকার হিসেবে। টিউবগুলোর মুখ রয়েছে আমাদের মাথার ওপর দিকে। তার পাশেই ঝুলছে টেলিফোনের যন্ত্র। ইস্পাত কক্ষে বসে বসেই শুনতে পাব বাইরে থেকে ভেসে আসা জাহাজ ক্যাপ্টেনের বিষন্ন কণ্ঠস্বর।

সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম সেই মুহূর্তে— সত্যিই কি যাত্রার জন্যে প্রস্তুত?

অসীম সহিষ্ণুতা দেখিয়ে জবাবটা দিলেন ডক্টর— অবশ্যই। বহাল তবিয়তে রয়েছি প্রত্যেকেই। আস্তে আস্তে নামাবেন— রিসিভারের সামনে একজনকে সর্বক্ষণ রেখে দেবেন সব কথা যেন শুনতে পায়। কখন কী অবস্থায় আছি, বলতে বলতে নিচে নামব। একদম নিচে নেমে যাওয়ার পরেও, যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন যতক্ষণ না নির্দেশ পাঠাচ্ছি। কাছির ওপর খুব একটা ধকল যাবে না। তবে সমুদ্রপথের মাইল দুয়েক আস্তে আস্তে যাওয়াই ভালো, কাছিতে বেশি জোর লাগবে না। এবার নামিয়ে দিন।'

শেষ শব্দদুটো এমন চেঁচিয়ে বললেন যেন মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। প্রকৃতই ক্ষিপ্ত! জীবনের চরম মুহূর্ত এসেছে বলেই অমন তারস্বরে চেঁচাতে পারলেন, এতদিন যে স্বপ্ন মনের মধ্যে চেপে রেখেছিলেন, এখন তা সফল হতে চলেছে। মুহূর্তের জন্যে আমার যদিও মনে হয়েছিল, মহাধুরন্ধর এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি নিশ্চয়। বিল স্ক্যানলান-এর মনের মধ্যেও ঠিক এই ভাবনাটাই খেলে গেছিল বলেই আমার দিকে বিদ্যুৎ চাহনি নিক্ষেপ করে কাষ্ঠহাসি হেসেছিল। সেই সঙ্গে কপালে হাত রেখেছিল এমনভাবে,

যার মানে দাঁড়ায় একটাই— যা আছে কপালে। কিন্তু ওই একবার আবেগের বিপুল বিস্ফোরণ দেখিয়েই ধাতস্থ হয়ে গেছিলেন আমাদের লিডার মশায়— ফিরে গেছিলেন ওঁর সেই বরাবরের সংযত ধীরস্থির ভঙ্গিমায়। পুঁচকে কক্ষের চারপাশের এলাহি বন্দোবস্ত দেখেই তো পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল, মাথা তাঁর কত ঠান্ডা, কত ভেবেচিন্তে হিসেবটিসেব করে এত যন্ত্রপাতি বানিয়ে যেতে পারেন, ভবিষ্যতের সব কথা আগেভাগে দূরকল্পনা দিয়ে যেন চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে। ভদ্রলোকের মনের শক্তির প্রশংসা না করে পারছি না।
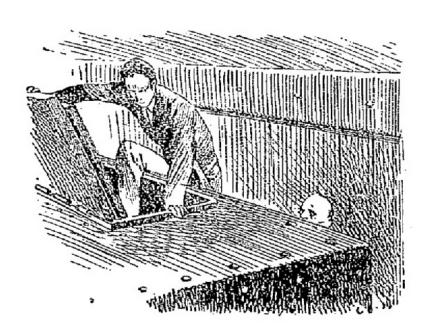
এরপর থেকেই আমাদের মন চলে গেছিল নতুন পরিস্থিতির দিকে, ওয়ান্ডারফুল নতুন অভিজ্ঞতার দিকে। মুহূর্তে নব নব রূপে বিকশিত হয়ে যাচ্ছিল সেই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। খুব আস্তে আস্তে সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করছিল ইস্পাতের খাঁচা। হালকা সবুজ রং পালটে গিয়ে এসে গেল গাঢ় জলপাই বর্ণ। সে রংও একটু একটু করে গাঢ় হতে হতে এসে গেল ওয়ান্ডারফুল নীল বর্ণ, খুবই ঝকঝকে গভীর নীল আস্তে আস্তে গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে গেল ধূসর বেগুনে। নামতে লাগলাম আরও নিচে, আরও নিচে— একশো ফুট, দু-শো ফুট, তিনশো ফুট। সঠিকভাবে চালু রয়েছে সব ক-টা ভাল্‌ভ কবাটিকা একদিকে আঁটা ঢাকনি। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক— যেমনটা ছিল জাহাজের ওপরে থাকার

সময়ে। আস্তে আস্তে ব্যাথিমিটারের কাঁটা আলোকময় ডায়ালের ওপর ঘুরে গিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছে জলতলের কত গভীরে আমরা পৌঁছেছি। চারশো, পাঁচশো, ছ-শো। মাথার ওপর দিকে দুম করে চেঁচিয়ে উঠল একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, 'কী রকম বুঝছেন?'

'ফাইন! এমন মজায় কখনও থাকিনি।' জবাবটা বেশ চেঁচিয়েই দিলেন ম্যারাকট। চারপাশে এখন দেখছি নিষ্প্রভ ধূসর গোধূলি— যা দ্রুত নিশ্চিদ্র অন্ধকার হতে চলেছে। চিৎকার করে বললেন আমাদের নেতা, 'থামা যাক এখানে!' আর না নেমে ঝুলে রইলাম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাতশো ফুট গভীরে। সুইচ টেপার ক্লিক শব্দ শুনলাম। পরমুহূর্তেই ভেসে গেলাম ঝকঝকে সোনালি আলোয়, যে আলো চারপাশের জানলা দিয়ে ধেয়ে গেল বাইরে — আলোকিত করে তুলল অপরিচ্ছন্ন জলের অনেক দূর পর্যন্ত। পুরু কাচে মুখ ঠেকিয়ে বসে রইলাম আমরা, দেখে গেলাম এমন দৃশ্য যা কখনও কোনও মানুষ দেখেনি।

জলের কতটা গভীরে এসেছি, তা বুঝতে পারছিলাম চারপাশের মাছেদের দঙ্গল দেখে। গোলকের গা ঘেঁষে ভেসে যাচ্ছে আহাম্মকের মতো জালের পরোয়া না রেখে। এরপরেই দেখতে পেলাম জলতলের অদ্ভুত সুন্দর রাজ্য। স্রষ্টার লক্ষ্য যদি মানুষ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় একটু অবাক হয়েই, জলতলে জীবের সাম্রাজ্য অনেক বেশি, বসতিও বেশি। শনিবার রাতের ব্রডওয়ে, সপ্তাহান্ত অপরাহ্নের লোমবার্ড স্ট্রিট এমন ভিড়ে গিজগিজ করে না, যেমনটা দেখলাম সেদিন চারদিকের চার গবাক্ষের মধ্যে দিয়ে। জলতলের যে জায়গাটায় মাছেরা হয় রংবিহীন, অথবা সুন্দর নীল রঙের ওপর দিকে আর রুপোলি রঙের নিচের দিকে— সে জায়গা আমরা পেরিয়ে এসেছি। দূর সমুদ্রের মীন মহাশয়দের সব রকমের বর্ণ আর আকৃতি, সুষমা আর সৌন্দর্য এখন দেখা যাচ্ছে। সূক্ষ্ম আকৃতির লেপ্টোকেফ্যালি অথবা ইল লার্ভা চকিত আলোকরশ্মির মতো টানা রেখায় ধেয়ে যাচ্ছে আলোকরশ্মির টানেলের মধ্যে দিয়ে। মুরোয়েনা-র মন্থর সর্পাকৃতি চেহারা, গভীর সমুদ্রের ল্যামপ্রে, গুটিয়ে পাকিয়ে দুমড়ে সরে সরে যাচ্ছে আলোক-টানেলের মধ্যে দিয়ে। তাদের সারা গায়ে খোঁচা খোঁচা কাঁটা, নির্বোধের মতো বদন বিস্তার করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। কখনও ভেসে যাচ্ছে চ্যাপটা চোয়াড়ে কাটল ফিশ, অমানবিক পৈশাচিক চাহনি মেলে দেখে যাচ্ছে আমাদের; কখনও কখনও খোলা সমুদ্রের ক্রিস্টাল-স্বচ্ছ প্রাণিরা উঁকি মেরে দেখছে নির্বোধ এই সমুদ্র বিহারীদের, কখনও ফুলের মতো শোভা দেখিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে সিসটোমা অথবা গ্লকাস। বিরাট একটা ঘোড়া ম্যাকারেল অথবা

বিপুলাকৃতি ক্যারন্‌ক্স বর্বরের মতো ঠুকরে ঠুকরে যাচ্ছে ক্রিস্টাল গবাক্ষর কাচ, তারপরেই তার পেছনে চলে আসছে সাত ফুট লম্বা হাঙরের কালো ছায়া— ব্যাদিত মুখগহ্বরে নিমেষে টেনে নিচ্ছে নির্বোধকে। ডক্টর ম্যারাকট মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছেন, হাঁটুর ওপর নোটবই রেখে লিখে লিখে যাচ্ছেন, আর বৈজ্ঞানিক মন্তব্যের অস্ফুট বচন উগড়ে দিচ্ছেন মুখগহ্বর থেকে। এটা কী? এটা কী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিমোরা মিরাবিলিস— যেমনটা বলেছিলেন মাইকেল মার্স। কী আশ্চর্য? এ যে দেখছি লেপিডিয়ন— কিন্তু এক্কেবারে নতুন জাতের বলেই তো মনে হচ্ছে। ম্যাকরুরাস ম্যাকরুরাস দেখছেন তো মিস্টার হেডলে? জালে পড়লে যে রং দেখায়, এখানে দেখাচ্ছে অন্য রং।' একবারই দেখলাম চমকে উঠতে। বিরাট একটা গোলমতন বস্তু বিপুল বেগে ধেয়ে গেল এক জানলা থেকে আর এক জানলায়, পেছনের লেজের কাঁপুনিতে জল নাড়িয়ে দিয়ে গেল, গবাক্ষর ওপর নিচের জল অনেক দূর পর্যন্ত। ডক্টরের মতন আমিও ভড়কে গেছিলাম। সমস্যার সমাধান জুগিয়ে দিল বিল স্ক্যানলান।

'জন জুইনি... জন জুইনি... কাচে মাথা ঠুকে ঠাট্টা করে গেল আমাদের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে বুঝিয়ে গেল, আমরা আর নিঃসঙ্গ নই!'

তাল ঠুকে বললেন ম্যারকট, 'তা-ই তো! তা-ই তো! প্লাসবাস লঙগিকডেটাস... নতুন জাতি। লেজখানা পিয়ানোর তারের মতো, নাকের ডগায় যেন এক ডেলা সিসে। দেখে নিন, মিস্টার হেডলে, দেখে নিন? ক্যাপ্টেন, সব ঠিক! আরও নামতে পারেন।'

ফলে, আরও নামলাম, আরও আরও। ইলেকট্রিক লাইট চালু করে দিলেন ডক্টর ম্যারাকট। ব্যাথিমিটারের প্রদীপ্ত ডায়াল ছাড়া ভেতরে এখন আলকাতরা কালো অন্ধকার। টিক টিক করে ঘুরে চলেছে ব্যাথিমিটারের কাঁটা। যত নিচে নামছি, কাঁটা তত ঘুরছে। দুলছি অল্প অল্প, এ ছাড়া গতিবেগ কিছু টের পাচ্ছি না বললেই চলে। ডায়ালের কাঁটার সঞ্চরণই শুধু জানিয়ে দিচ্ছে আমাদের অতি ভয়াবহ কল্পনাতীত অবস্থান। এখন নেমে এসেছি এক হাজার ফুট নিচে।

নিঃশ্বাসের বাতাস বেশ ভারি হয়ে উঠেছে— নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডিসচার্জ টিউবের ভাল্‌ভটায় তেল দিয়ে দিল স্ক্যানলান— বাঁচা গেল। দেড় হাজার ফুট নিচে নেমে থেমে গেলাম— প্রজ্বলন্ত আলোক বর্শা চারদিকে ছুটিয়ে দিয়ে মধ্য সমুদ্রে ভেসে রইলাম। বৃহদাকার কালচে বেশ কিছু আকৃতি সাঁ সাঁ করে ধেয়ে গেল সামনে দিয়ে। কিন্তু বুঝলাম না, তারা গভীর সমুদ্রের হাঙর, না, তলোয়ার মাছ। অন্য কিছু অজানা সাগর দানবও হতে পারে। তড়িঘড়ি আলো জ্বালিয়ে দিলেন ডক্টর। বললেন— এই গুলোই হচ্ছে আস্ত আপদ। এত গভীর জলে এমন সব প্রাণী আছে যাদের গুঁতো মৌচাকে গন্ডারের গুঁতোর সমান।'

শুনে তো গা হিম হয়ে গেল আমার।

স্ক্যানলান বললে, 'তিমি নাকি?'

ম্যারাকট বললেন, 'তিমি মহাশয়রা অনেক গভীরে যায়। গ্রিনল্যান্ডের একটা তিমি সোজা গোঁৎ মেরে এক মাইল নিচে চলে গেছিল। তবে, চোট না পেলে, ভয় না পেলে,

অত নিচে তিমিরা অবতরণ করে না। যেটা গেল এইমাত্র, খুব সম্ভব সেটা দানব স্কুইড। এদের নিবাস জলের সব রকম গভীরতায়।'

'স্কুইডদের গা খুব নরম হয়। গুঁতোক, কিস্যু হবে না। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে যদি একটা স্কুইড মেরিব্যাঙ্ক-এর নিকেল ইস্পাত দাঁড়া দিয়ে ফুটো করে দেয়।

প্রফেসর বললে, 'শরীর ওদের নরম তুলতুলে হতে পারে, তবে বড় সাইজের যে কোনও স্কুইড লোহার পাতও কেটে দু-টুকরো করে দিতে পারে। ঠোঁটের ঠোক্কর মেরে এক ইঞ্চি পুরু জানলা ফুটো করে দিতে পারে পার্চমেন্ট কাগজ ফুটো করার মতো।'

'কী মজা?' ফের নিচে নামতে নামতে সোল্লাসে বলেছিল বিল।

তারপর খুব আস্তে, খুব আলতোভাবে স্থগিত হয়েছিল আমাদের নিম্ন অবতরণ। এত আস্তে, এত নরমভাবে তলদেশ ছুঁয়েছিল যে প্রথম দিকে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি—তারপর বুঝলাম যখন, দেখলাম কুণ্ডলী পাকিয়ে কাছি নেমে যাচ্ছে ক্রিস্টাল জানলার সামনের আলোর মধ্যে দিয়ে। দঙ্গল পাকিয়ে কাছি যদি এইভাবে ঢিলে হয়ে পড়তে থাকে তাহলে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের টিউব ছিঁড়ে যেতে পারে। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ম্যারাকট। কাছি টেনে তুলে নেওয়া হয়েছিল ওপরে। ডায়ালের কাঁটা দাঁড়িয়ে আছে আঠারোশো ফুট জলতল গভীরতায়। আটলান্টিকের একদম নিচে এসে পড়েছি একটা মধ্য মহাসাগরীয় আগ্নেয় ভূ-শিরার ওপরে।

(২)

বেশ কিছুক্ষণ আমরা সকলেই থেকেছি একই রকম অনুভূতির মধ্যে। কিছুই আর করতে চাইনি, দেখতে চাইনি। চেয়েছি শুধু চুপচাপ বসে থেকে বিস্ময়কে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যাক। এসেছি কোথায়? এই পৃথিবীর অন্যতম বিরাট মহাসাগরের একদম নিম্ন কন্দরে। তারপরেই জানলায় জানলায় আলোর ছটার মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত দৃশ্যাবলী দেখবার জন্যে সবাই ছুটে গেলাম জানলার সামনে।

আমরা এসে পড়েছি অ্যালজি অর্থাৎ শৈবালশ্রেণীর ওপর (ম্যারাকট বললেন— 'কাটলারিয়া মালাটিফিডা'), যার হলুদ রঙের ফার্ন বা তালগাছের পাতার মতো অংশ দুলছে চোখের সামনে আমাদের চারপাশে, নড়ে সরে দুলে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রের কোনও এক স্রোতের টানে, ঠিক যেভাবে গ্রীষ্মের মৃদু পবনে দুলে দুলে ওঠে তালগাছের পাতা। আমাদের দৃষ্টিপথ আটকে দেওয়ার মতো নয় কোনওটাই, যদিও তাদের মস্ত চ্যাটালো পাতা, আলোর সামনে গভীর সোনালি বর্ণ ধারণ করে, দুলে দুলে উঠছে আমাদের দৃষ্টিপথের সামনে। এদের ওদিকে রয়েছে ঢালু মতো জায়গায় কালচে ধাতুমল-এর বস্তু, জায়গায় জায়গায় দল বেঁধে রয়েছে সুন্দর রঙিন প্রাণীরা হোলোথুরিয়ান, অ্যাসিডিয়ান, ইচিনি আর ইচিনোডার্ম— ইংলিশ বসন্ত ঋতুতে যেমন হায়াসিন্‌থ আর বাসন্তী পুষ্পবিশেষের সমারোহ দেখা যায় সেইভাবে। সাগরতলের এই পুষ্পরা বুঝি সজীব; কারও বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত, কারও ঘন বেগুনি, কারও সূক্ষ্ম গোলাপি। কয়লাকালো পটভূমিকায় এরা গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে বিপুল পরিমাণে অবস্থান করছে। এখানে সেখানে কালচে পাথরের ফাঁক ফোকর থেকে বড় বড় স্পঞ্জ বেরিয়ে এসে দুলে দুলে উঠছে, আলোক বলয়ের মাঝখান দিয়ে মাঝে মাঝে সাঁৎ সাঁৎ করে ঠিকরে যাচ্ছে বিদ্যুৎ বর্ণের বাহার দেখিয়ে। মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমরা চেয়ে আছি এই পরিলোকের দিকে। ঠিক এই সময়ে একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর নেমে এল নলের মধ্যে দিয়ে, 'সাগরতল লাগছে কেমন? সব ঠিক তো? বেশি দেরি করবেন না। মিটারের মাত্রা নামছে, আমার ভালো ঠেকছে না। আরও বাতাস দেব কি? আর কিছু করতে পারি?'

প্রফুল্লস্বরে ম্যারাকট বললেন, 'ক্যাপ্টেন, সব ঠিক আছে। বেশিক্ষণ থাকব না। ভালোই রেখেছেন আমাদের। গুড নার্সিং! বসে আছি যেন বাড়ির বৈঠকখানায়। একটু পরেই আস্তে

আস্তে সামনের দিকে নিয়ে যাবেন।'

আমরা এসে পড়েছি আলোকময় মীন মহাশয়দের অঞ্চলে। আমাদের আলো নিভিয়ে দিয়ে বেশ মজা পেলাম। নিঃসীম অন্ধকার। তমালকালো তমিস্রা। এমনই নিরেট আঁধার যে ঘণ্টাখানেক সেন্সিটিভ প্লেট ঝুলিয়ে রাখলেও অতিবেগুনি রশ্মির রেখা পর্যন্ত পড়বে না। এমন তমিস্রার মধ্যে দিয়েই দেখে গেলাম সাগরতলের স্বতঃদীপ্ত তৎপরতা। নিশুতি রাতে জাহাজের পোর্টহোল দিয়ে যে রকম আলো ঠিকরে যায়, যেন ঠিক সেইভাবে কালো মখমলের বুকে অবিরাম গতিতে সরে সরে যাচ্ছে অত্যুজ্জ্বল প্রভার ছোট্ট ছোট্ট কণিকা। আলোকময় দংষ্ট্রাল একটা মীন মহাশয় অতর্কিত আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ধেয়ে গেল জানলার সামনে দিয়ে। ঠিক যেন বাইবেলের কায়দায়। তারপরেই ধেয়ে এল সোনালি শুঙ্গ দেখিয়ে একটা মৎস্য। তার পেছন পেছন মাথায় আগুনের মতন পালকওলা আর একটা। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখতে পেলাম অত্যুজ্জ্বল বিন্দুসমূহ ঝলক মেরে যাচ্ছে কয়লাকালো আঁধারের মধ্যে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ নিয়ে শশব্যস্ত, নিজের নিজের আলোয় পথ দেখে নিচ্ছে— ঠিক যেভাবে স্ট্র্যান্ডের চত্বরে থিয়েটারের সময়ে রাতের ট্যাক্সিগাড়িগুলো আলো জ্বালিয়ে ছুটে ছুটে যায়। একটু পরেই জ্বালিয়ে নিলাম নিজেদের আলো। সমুদ্রতলের বিবরণ খুঁটিয়ে লিখতে বসে গেলেন ডক্টর ম্যারাকট। বললেন, 'অনেকটা নিচে নেমেছি বটে, কিন্তু আরও নিচে না নামলে উপপাতালিক স্তরে পৌঁছোনো যাবে না। সে জায়গা অবশ্য আমাদের একদম বাইরে। আরও লম্বা কাছি লাগিয়ে সে চেষ্টা আর একবার—'

খ্যাঁক করে উঠেছিল বিল, 'থামুন তো!'

মুচকি হাসলেন ম্যারাকট, 'গভীর সমুদ্রের গভীরতা সয়ে যাবে, স্ক্যানলান। এই শেষ নয়।'

'গোল্লায় যান,' বিড়বিড় করে বলেছিল বিল।

'তখন কিন্তু মনে হবে বুঝি স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজের খোলে ঢুকে বসে আছেন— তার বেশি নয়। মিস্টার হেডলে, দেখেছেন নিশ্চয় এখানকার জমিতে ঝামাপাথর আর কালচে আগ্নেয়পাথর চাঁই চাঁই পড়ে রয়েছে। তারই মাঝ দিয়ে বেরিয়েছে জলজ উদ্ভিদ আর কাচের মতন স্পঞ্জ। এ থেকেই সুপ্রাচীন পাতালিক আগ্নেয় সমাবেশের আইডিয়াটা মাথায় আনতে পারেন। ফলে বহাল থাকছে আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত— এই যে মধ্য মহাসাগরীয়

ভূশিরা এর উৎপত্তি ঘটেছে অতীতের এক অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। জায়গাটার নাম দিলাম 'ম্যারাকট ডিপ'— বলে, চোখ ঘুরিয়ে ওপরে তাকিয়ে চালিয়ে গেলেন— এ জায়গা আসলে একটা পাহাড়ের ঢাল। 'ডিপ' কতদূর গেছে, সেটা যাচাই করার জন্যে এই খাঁচাটাকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া দরকার। তাহলেই দেখা যাবে, কী আছে সেখানে। আমার মনে হয়, দেখতে পাব ঢল নেমে গেছে আরও অতল জলের গভীর অঞ্চলে। এমন একটা এক্সপেরিমেন্ট করবার সময় এখন হয়েছে বলেই আমি মনে করি।'

আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, এক্সপেরিমেন্টটা হবে অতিশয় বিপজ্জনক। সরু কাছি কতক্ষণ টিকবে? এই খাঁচাকে কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে? কিন্তু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করার সময়ে ম্যারাকটের কাছে বিপদ শব্দটা মোটেই আমল পায় না— সে বিপদ নিজের হোক, কি অন্যের হোক। তাই যখন দেখলাম, ইস্পাতের বাক্স একটু নড়তেই কাছিতে টান পড়ছে, সমুদ্রের আবর্জনা সরিয়ে অল্প অল্প অগ্রসর হতেই কাছির দম বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন আপনা থেকেই আমার দম আটকে এসেছিল, একই অবস্থা হয়েছিল বিল স্ক্যানলানেরও। টান টান হয়ে গিয়েও কাছি বুঝিয়ে দিল তার শক্তপোক্ত অবস্থা এবং গোটা ইস্পাতের বাক্সটাকে আস্তে আস্তে পিছনে নিয়ে গেল সাগরতল দিয়ে। হাতের চেটোয় কম্পাস রেখে হুকুমের পর হুকুম ছেড়ে গেলেন ম্যারাকট, মাঝে মাঝে সামনে বাধা পড়লে খাঁচাকে টেনে তুলে নিয়ে ফের নামিয়ে দিতে বললেন।

যেতে যেতে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন এইভাবে, 'এই যে ক্ষারীয় আগ্নেয়শিলার মধ্যমহাসাগরীয় ভূশিরা, এটা লম্বায় হবে বড় জোর মাইল খানেক। যেখানে ডুব দিয়ে নেমে এসেছিলাম। হিসেব করে দেখেছি, সেখান থেকে পাতালিক অঞ্চলটা আছে পশ্চিমদিকে। এই গতিবেগে গেলে শীগগিরই পৌঁছে যাব সেখানে।'

নির্বিঘ্নে পিছলে গেলাম আগ্নেয় প্রান্তরের ওপর দিয়ে। চারপাশে দুলে দুলে উঠল সোনালি শৈবাল রাজ্য— প্রকৃতির হিরে-কাটিয়ে যে অনুপমভাবে গড়ে রেখেছেন সমুদ্রতল অপরূপ মণিমাণিক্য দিয়ে। আচমকা টেলিফোনের দিকে ধেয়ে গেলেন ডক্টর।

বললেন তারস্বরে, 'থামান এখানে! যেখানে যেতে চাই, এসে গেছি সেখানে।'

আচমকা আমাদের সামনে ব্যাদিত মুখে উপস্থিত হয়েছে দানবিক ফাঁক। সে বড় ভয়ানক জায়গা, রাতের দুঃস্বপ্ন জাগানোর মতো জায়গা। কালচে আগ্নেয়শিলার খাড়াই খাদ সোজা নেমে গেছে অজানা অতলান্ত গভীরে। তাদের কিনারায় কিনারায় থুকথুক করছে

প্রজ্বলন্ত শৈবাল পত্র— পৃথিবীর খাদের গায়ে যেমনটা দেখা যায়, কিন্তু এখানে এই দুলন্ত কেঁপে কেঁপে যাওয়া পত্রাবলীর মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবল খাদের কালচে চকচকে দেওয়াল। পাথুরে প্রাচীর বেঁকে গিয়ে সরে গেছে আমাদের দিক থেকে, খাদ যে কত গভীর তা আন্দাজি হিসেবেও আনা যাচ্ছে না, কেননা আমাদের জোরালো আলো নিচের নিকষ আঁধারে পথভ্রান্ত হয়েছে। সিগন্যাল দেওয়ার লুকাস ল্যাম্প ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিচের দিকে, অনেক নিচ পর্যন্ত, সোনালি আলোক বল্লম ধেয়ে গিয়েও অবশেষে হারিয়ে গেছিল ভয়াবহ খাদের শ্বাসরোধী তমিস্রায়।

চোখে মুখে বিপুল হর্ষ ফুটিয়ে তুলে সোল্লাসে বলেছিলেন ম্যারাকট— 'ওয়ান্ডারফুল! এত নিচে এর আগে কেউ কখনও নামেনি। এমন গভীরতার সন্ধানই পায়নি। ল্যাড্রোন দ্বীপপুঞ্জের কাছে চ্যালেঞ্জার ডিপ তো মোটে ছাব্বিশ হাজার ফুট গভীর, ফিলিপাইন্স এর কাছে প্লাসট ডিপও মাত্র বত্রিশ হাজার ফুট, সবাইকে বোধহয় টেক্কা দিয়ে গেল ম্যারাকট ডিপ, অনেক অনেক আটলান্টিক অভিযাত্রীর নজরে পড়েনি আজ পর্যন্ত। নিঃসন্দেহে বলা যায়—'

কথাটা অসমাপ্ত রেখে বিষম বিস্ময়ে আগ্রহ প্রদীপ্ত চোখে চেয়ে থেকে চমকে উঠেছেন ম্যারাকট। তাঁর ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে আমরা যা দেখেছিলাম, তা আমাদের চমকিত চক্ষুর ভেতর দিয়ে গা হিম করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

খাদের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত আমাদের আলোক সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে অতিকায় কোনও এক জানোয়ার। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে তার কালচে কুঁজো, মস্ত বপুর মন্থর অগ্রগতি উঠে আসছে একটু একটু করে। খাদের কিনারার দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছে অদ্ভুত অবয়বের প্যাডেল নাড়িয়ে নাড়িয়ে। আরও কাছে চলে আসতেই এসে গেল আলোকরশ্মির ফোকাসের আওতায়, দেখতে পেলাম তার গা হিম করা আকৃতি আরও সুস্পষ্টভাবে। বিরাট এই পশুর সন্ধান পায়নি বিজ্ঞান আজও, অথচ এর আকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচিত অবয়বের কোথায় যেন একটা মিল আছে। বিশাল কাঁকড়ার চাইতে অনেক দীর্ঘ, বিশাল গলদা চিংড়ির চাইতে অনেক ছোট, একে দেখতে অনেকটা ক্রেকিশ চিংড়ির মতন। দুটো রাক্ষুসে সাঁড়াশি ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে দু-দিকে, কালচে ম্যাড়মেড়ে ক্রুর দুই চক্ষুর সামনে লকলক করছে একজোড়া ষোলো ফুট লম্বা

অ্যান্টেনা। কচ্ছপ বা কাঁকড়ার মতো বর্ম, দেহের বর্ণ হালকা হলুদ— আড়াআড়িভাবে প্রায় দশ ফুট, অ্যান্টেনা ছাড়া লম্বালম্বিভাবে কম করেও তিরিশ ফুট।

'ওয়ান্ডারফুল!' সোল্লাসে বললেন ম্যারাকট, সেই সঙ্গে মরিয়া কায়দার লেখা চালিয়ে গেলেন নোটবইতে— 'উকুন চোখ, নমনীয় খোলস— কাঁকড়া বা চিংড়ির মতো, প্রজাতি অজানা। নাম দেওয়া যাক ফ্রামটেসিয়া ম্যারাকটি— নিশ্চয় হোক এই নাম, হবে না কেন? কেন?'

কানের কাছে চিৎকার করে বলেছিল বিল, 'নাম না হয় আমি অনুমোদন করে দিলাম, কিন্তু আলোগুলো এখন নিভিয়ে দিলে হয় না?'

'আর একটু, আর একটু... জালিকাকৃতি শিরা বিন্যাসের গঠনটা দেখে নিই? ব্যাস ব্যাস, হয়ে গেছে ওতেই হবে!' বলেই খট করে টেনে দিলেন আলোর সুইচ। সঙ্গে সঙ্গে তমাল কালো তমিস্রায় ঢেকে গেল চারদিক, শুধু দেখা গেল চাঁদবিহীন রাতের আকাশে উল্কাদের ছুটোছুটির মতন আলোক কণিকাদের দৌড়াদৌড়ি।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বিল বললে, 'বিশ্বের জঘন্যতম জানোয়ার কোথাকার? হাত-পা ঠান্ডা করে দেওয়ার মতন কুৎসিত কদাকার!'

ম্যারাকটের মন্তব্য, 'দেখতে কদাকার হতে পারে, স্বভাব চরিত্রও ভয়ানক হতে পারে, দানবিক দাঁড়ার পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই, তাও বুঝি। তবে কি জানেন, ইস্পাতের খাঁচার মধ্যে থেকে অনায়াসেই অতীব স্বচ্ছন্দে এবং বিলকুল নিরাপদে আমরা হারামজাদার ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে পারি।'

ম্যারাকটের মুখের কথা শেষ হতে না-হতেই ইস্পাত কক্ষের বাইরের দেওয়ালে যেন গাঁইতি আর শাবলের ঘা পড়ল। তারপরেই বেশ কিছুক্ষণ আঁচড়ানি, পরিশেষে আবার সেই ঠোক্কর। ভয়ানক টোকা। যেন নক করা হচ্ছে দরজায়।

সভয়ে বললে বিল স্ক্যানলান, 'আরে গেল যা! হারামজাদা যে ভেতরে আসতে চায়। বাইরে "প্রবেশ নিষেধ" লিখে দেওয়া উচিত ছিল।' মজার ঢঙে কথাগুলো বলে গেলেও কণ্ঠস্বরের কম্পন থেকে মালুম হয়ে গেল, কী পরিমাণ ভয় পেয়েছে বিল। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ঠকঠক করে কাঁপছিল আমার হাঁটু দুটোও। বাইরের ওই শয়তানের ক্রমাগত ইস্পাত কক্ষ আঁচড়ে যাওয়ার সময়ে, জানলাগুলোর সামনে দিয়ে তার বারংবার বিষম

অবয়বের সরে সরে যাওয়ার সময়ে, যেন অদ্ভুত এই খোলসটাকে বাজিয়ে দেখে নিচ্ছে ভেতরকার শাঁস খেতে দরকার আর কতখানি হিম্মত।

ম্যারাকট বললেন, 'আমাদের গায়ে টুসকি ফেলবার ক্ষমতাও নেই ওর!' বললেন বটে, কিন্তু কথার সুরে মনের জোর খুব একটা দেখলাম না— 'পিশাচটাকে পালটা ঠোক্কর মেরে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, বজ্জাতির জায়গা এটা নয়।'

বলেই, হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেনকে, 'টেনে তুলুন বিশ থেকে তিরিশ ফুট।' কয়েক সেকেন্ড পরেই উঠে এলাম লাভা প্রান্তর থেকে, বেশ দুলতে লাগলাম স্থির জলের মধ্যে। ভীষণাকৃতি জানোয়ারটা দেখলাম ভয়ানক নাছোড়বান্দা। একটু পরেই ফের টের পেলাম কর্কশ কঠোর দাঁড়া বুলিয়ে টোকা মেরে যাচ্ছে ইস্পাত কক্ষের সব দিকে। এই রকম একটা ভয়ানক সাক্ষাৎ মৃত্যুর এত কাছে থেকে চুপচাপ বসে থাকা যায় না। বিশাল বিপুল আর ভয়ানক শক্ত ওই দাঁড়া যদি জানলার কাচে টোকা দিতে শুরু করে, তাহলেই তো গেছি। কাচের ক্ষমতা নেই ওই ইস্পাত কঠিন দাঁড়ার ঠোক্কর থেকে নিজেকে আস্ত রাখার। একই ভীতি যে সঞ্চারমান প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে তা মালুম হয়ে গেল মুখাকৃতি দেখেই।

আর তারপরেই উপস্থিত হল এর চাইতেও বিপজ্জনক আর অপ্রত্যাশিত একটা আপদ। দেওয়ালের টোকা বন্ধ হয়েছে, শুরু হয়েছে ছাদে, গোটা ঘরটা ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলে দুলে উঠছে ছন্দে ছন্দে।

চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল আমার গলা চিরে, ‘কী সর্বনাশ! কাছি ধরে টানছে যে! ছিঁড়ে যাবে এক্ষুনি!’

বিল স্ক্যানলান বললে মিষ্টি মিষ্টি শক্ত গলায়, ‘ঢের হয়েছে। এবার বাড়ি ফেরা যাক।’

সঙ্গে সঙ্গে চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন ম্যারাকট, ‘যাচ্চলে। কাজ তো এখনও শেষ হয়নি। সবে তো অর্ধেক হল! ডিপ-এর কিনারাটুকু শুধু দেখা হল। চওড়ায় কতখানি, সেটা তো দেখা দরকার। অন্য দিকটায় পৌঁছোই, তারপর ওঠা যাবে ওপরে।’ বলেই টিউবের

মধ্যে দিয়ে হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেনকে, 'ক্যাপ্টেন, সব ঠিক আছে। দু-নট স্পিডে খাঁচা নিয়ে যান— যতক্ষণ না থামতে বলি।'

পাতাল খাদের কিনারা বরাবর ধীরগতিতে এগিয়ে গেল আমাদের খাঁচা। কুচকুচে কালো তমিস্রার আবরণে থেকে আক্রমণ থেকে যখন পরিত্রাণ পাওয়া যায়নি, তখন জ্বালিয়ে দেওয়া হল সব ক-টা আলো। একটা পোর্টহোল পুরোপুরি ঢেকে গেছে সম্ভবত বাইরের ওই মূর্তিমান আতঙ্কের নিম্ন উদরের চাপে। মস্তক আর সাঁড়াশি নিশ্চয় খুটখাট কাজ করে চলেছে মাথার ওপর দিকে। গোটা ঘরটা রয়েছে দোদুল্যমান অবস্থায় গির্জের ঘণ্টার মতো। জানোয়ারটার গায়ের জোর নিশ্চয় অপরিসীম। জলপৃষ্ঠের পাঁচ মাইল নিচে এসে মরলোকের কোনও বাসিন্দা এমন বিপদে কখনও পড়েনি। কালান্তক সেই আতঙ্ক রয়েছে ঠিক মাথার ওপর। দুলুনি একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। কাছিতে ঘন ঘন টান পড়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে বিষম চেঁচানি শুরু করেছেন ক্যাপ্টেন মশায় জাহাজে বসে, ইস্পাত খাঁচায় বসে তা শুনতে পাচ্ছি। বিষম নৈরাশ্যে দু-হাত শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠলেন ভয়ানক উত্তেজিত ম্যারাকট। খাঁচার মধ্যে থেকেও টের পেলাম একটু একটু করে ছিঁড়ছে ইস্পাত দিয়ে মজবুত কাছি। তারপরেই তলিয়ে যেতে লাগলাম নিতল খাদের গভীরে।

ম্যারাকট চেঁচিয়ে উঠলেন তারস্বরে।

'কাছি ছিঁড়ে গেছে! আর কিছু দরকার নেই! মরণ সুনিশ্চিত প্রত্যেকের!' বলছেন আর টেলিফোনের তার খামচে ধরছেন, 'বিদায়, ক্যাপ্টেন, বিদায় জানাচ্ছি সব্বাইকে।'

পৃথিবীর মানুষদের কাছে এই তাঁর শেষ কথা।

পতন কিন্তু খুব একটা দ্রুত হল না, যা ভাবছেন, তা নয়। থাকতে পারে খাঁচাসমেত নিজেদের ওজন, কিন্তু পদার্থের প্লবতা ধর্ম অনুযায়ী আমরা নেমে যেতে লাগলাম একটু একটু করে— খাঁচা তো নিরেট নয়, ফাঁপা। হারামজাদা যে বিকট জানোয়ারটার জন্যে আমাদের এহেন হাল, সে কিন্তু সমানে আঁচড় আর ঠোক্কর দিয়ে চললো খাঁচা-খোলসের গায়ে। তারপরেই চক্রাকারে গতিশীল অবস্থায় মসৃণভাবে খাঁচা নেমে গেল খাদের নিতল অঞ্চল অভিমুখে। মিনিট পাঁচেকে মনে হয়েছিল যেন ঘণ্টাখানেক, তারপরেই পলকা সুতোর মতন পট করে ছিঁড়ে গেল টেলিফোনের তার। একই সময়ে ছিন্ন হল আমাদের বাতাসের নল। ফুটো দিয়ে হুড় হুড় করে ঢুকতে লাগল নোনা জল। চটপটে পটু হাতে দুটো নলকেই দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল বিল স্ক্যানলান। তাতেই বন্ধ হল জল ঢোকা। একই

সঙ্গে হাত চালিয়ে ডক্টর খুলে দিলেন চেপে রাখা বাতাসের টিউব— হুস হুস করে বেরিয়ে এল বাতাস। তার ছিন্ন হওয়ার সময়ে আলো নিভে গেছিল। ওই অন্ধকারের মধ্যেই হাত চালিয়ে ড্রাই ব্যাটারিতে তার জুড়ে দিলেন ডক্টর, যার ফলে আলো জ্বলে উঠল সিলিং-এ।

বললেন শুষ্ক হেসে, ‘এতেই চলে যাবে দিন সাতেক। মরবার সময়ে আর কিছু না পাই, আলো তো পাব।’ এই পর্যন্ত বলেই মাথা নাড়লেন খুবই বিষন্নভাবে। পরক্ষণেই দেখলাম চোখে মুখে ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধ কোমল হাসির ছটা, ‘আমার না-হয় বয়স হয়েছে, এই পৃথিবীতে আমার করণীয় অনেক কাজ করে গেলাম। পরিতাপ রইল শুধু একটা জায়গায় — আপনাদের দু-জনকে আমার পথের পথিক না করলেই পারতাম। ইয়ংম্যান— দু-জনেই। ঝুঁকিটা একলা নেওয়া উচিত ছিল।’
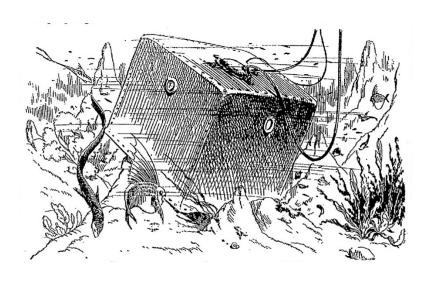
আমি ওঁর অনুতাপ কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে জোরের সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়েছিলাম। মুখে কথা বলবার মতো অবস্থা ছিল না। বিল স্ক্যানলান-এর মুখেও কোনও কথা জোগালো না। নেমে যেতে লাগলাম আস্তে আস্তে, কতটা নিচে নামছি, তা বুঝতে পারছি জানলাগুলোর সামনে আঁধার কালো মাছেদের সাঁ সাঁ করে ওপরদিকে উঠে যাওয়া দেখে। ঠিক যেন নিজেরাই ধেয়ে যাচ্ছে ওপরদিকে, আমরা যে তলিয়ে যাচ্ছি, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তখনও দুলে দুলে যাচ্ছে গোটা ইস্পাত কক্ষ, এমনভাবে দুলতে থাকলে ইস্পাত কক্ষ একদিকে হেলে পাশ ফিরতে পারে, অথবা একেবারেই উল্টে গিয়ে মাথা নিচে পা ওপরে করে দিতে পারে, অথবা কপালক্রমে আমাদের নিজস্ব ওজন সেটি হতে দেয়নি, ভারসাম্য

ঠিক রেখে দিয়েছিল। ব্যাথিমিটারের দিকে চক্ষু চালনা করে দেখলাম, পৌঁছে গেছি প্রায় এক মাইল গভীরতায়।

এমন সময়ে যৎকিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদের সুরে ম্যারাকট বললেন, 'দেখলেন তো, যা বলেছিলাম, ঠিক তা-ই। সমুদ্রবিদ্যা সমিতিতে আমার লেখা আমার প্রবন্ধটা নিশ্চয় পড়া আছে আপনাদের। বিষয়টা ছিল জলের গভীরতার সঙ্গে জলের চাপের সম্পর্ক নিয়ে। রুখে দাঁড়িয়েছিলেন গিসেন-এর বালো। তাঁর মুখের মতো জবাব দেওয়ার সুযোগ যদি পেতাম...!'

ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল মেকানিক বিল স্ক্যানলান, 'যাচ্চলে! আমি ভাবছি ফিলাডেলফিয়ার এক খুদে রমণীর কথা যে কিনা কেঁদে ভাসিয়ে দেবে বিল পটল তুলেছে শুনলে। আপনার ওই চৌকস মগজ পণ্ডিতের থোড়াই কেয়ার করি আমি।

আমি ওর হাতে হাত রেখে বলেছিলাম, 'আসা উচিত হয়নি আপনার।'

'দূর মশায় না এলে কাঁচকলা কী কাজটা করতাম? এসেছি একটা কাজের কাজ করতে!'

'আর কতক্ষণ?' একটু থেমে জিজ্ঞেস করেছিলাম ডক্টরকে। উনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সাগরের সত্যিকারের তলদেশ দেখতে এখনও অনেক দেরি বলেই তো মনে হচ্ছে। নলের মধ্যে বাতাস যা আছে, তাতে প্রায় একটা দিন চলে যাবে। সমস্যাটা হচ্ছে শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া আবর্জনাদের নিয়ে। কার্বন ডাই অক্সাইডের খপ্পর থেকে যদি রেহাই পাওয়া যেত—'

'সেটা অসম্ভব।'

'খাঁটি অক্সিজেনের টিউব আছে একটা। এনেছিলাম হঠাৎ দুর্গতির কথা ভেবে। তা থেকেই অল্প অল্প করে নিয়ে অনেকক্ষণ চালানো যাবে। দেখতেই পাচ্ছেন, নেমে এসেছি দু-মাইলেরও বেশি।'

'টিকিয়ে রাখার দরকার কী আমাদের? ঝটপট মরে গেলেই তো ল্যাটা চুকে যায়!'

ম্যারাকট বললে, 'যাচ্চলে! তাহলে তো অতিশয় ওয়ান্ডারফুল দৃশ্যটাই আর দেখা হবে না— সে দৃশ্য এমনই যা মর্তের মানুষ কখনও দেখেনি। অমন কাজ করা মানে বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা দেখব, তা লিখে রাখতে হবে। সে লেখা যদি আমাদের সঙ্গে সাগরের কবরে যায়, তাহলেও লেখা থামানো চলবে না।'

'তা-ই হোক,' সোল্লাসে বললে বিল স্ক্যানলান।

সোফার কিনারা কষে আঁকড়ে ধরে বসে রইলাম তিনজনে, জানলার সামনে দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ধেয়ে যেতে লাগল ওপর দিকে, যার মানে, আমরা আরও অতলে তলিয়ে যাচ্ছি।

ম্যারাকট হৃষ্ট স্বরে বললেন, 'আসা গেল তিন মাইল। মিস্টার হেডলে, অক্সিজেনের টিউব খোলবার এবার কিন্তু সময় হয়েছে।' বলে, একটু শুষ্ক হাসি হাসলেন, 'ম্যারাকট ডিপ-এর মাপ নেওয়ার সময়ও হয়েছে। ক্যাপ্টেন হোয়ি এই খবর যখন পৌঁছে দেবেন মর্তের পণ্ডিতদের কাছে, তখন তারা বলতে বাধ্য হবে— ম্যারাকট মরেও নিজের মনুমেন্ট বানিয়ে গেল।'

এরপর নিঃশব্দে বাসে বসে দেখলাম, কাঁটা পৌঁছে গেল চার মাইলের গভীরতায়। একবার ভারি কিছুতে ধাক্কা লাগতেই আর একটু হলে উল্টে যেতাম। হয় কোনও বড় মাছের গায়ে, নয়তো খাদ থেকে, বেরিয়ে থাকা কোনও পাথরে ধাক্কা মেরেছে ইস্পাত কক্ষ। খাদের যেন শেষ নেই। ইস্পাত-কক্ষ ঘুরে ঘুরে নেমেই চলেছে কালচে সবুজ আবর্জনার মধ্যে দিয়ে। ডায়ালে দেখা গেল, নেমেছি পঁচিশ হাজার ফুট নিচে।

ম্যারাকট বললেন, 'যাত্রা শেষ হতে চলেছে। এখানকার সবচেয়ে গভীরতা ছাব্বিশ হাজার সাতশো ফুট বলেই জানা গেছিল আগের এক রেকর্ড অনুযায়ী। মিনিট কয়েকের মধ্যেই জানা যাবে, ভাগ্য আমাদের নিয়ে এলো কোথায়। ধাক্কার চোটে অক্কা পেতেও পারি। অথবা—'
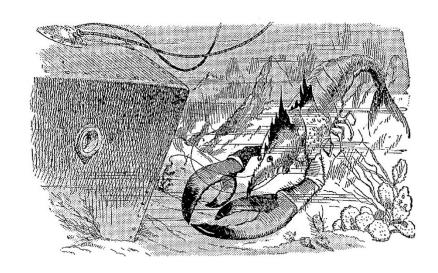
ঠিক তখনই তলদেশ স্পর্শ করেছিল ইস্পাত কক্ষ। ঠিক যেন বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল জননী আটলান্টিকের গভীরতম অঞ্চলে। নমনীয় পুরু স্তূপের ওপর অবতরণ ঘটায় চোট লাগল না একদম— ঝাঁকুনি লাগল না একটুও। বসে রইলাম যে যার সোফায় একইভাবে। বেশ বুঝলাম, একটু একটু দুলছে ইস্পাতকক্ষ। ঠেলে বেরিয়ে আসা কোনও পাথরের ওপর জমে থাকা আবর্জনা-কাদায় নিশ্চয় আটকে গিয়ে টলে টলে উঠছে। এ রকমভাবে দুলতে থাকলে ফের গড়িয়ে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সেরকম কিছু ঘটল না। দুলুনি আস্তে আস্তে থেমে গেল। একটা পোর্ট হোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সবিস্ময় চিৎকার ছাড়লেন ম্যারাকট এবং ঝটপট নিভিয়ে দিলেন বিদ্যুৎবাতি।

কী আশ্চর্য! তা সত্ত্বেও সবই দেখতে পেলাম স্পষ্টভাবে। বাইরে বিরাজ করছে ফিকে কুয়াশাসম আলোক প্রভা— ঠিক যেন শীতের সকাল। চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলাম অদ্ভুত দৃশ্যটার দিকে। নিজেদের আলোর সাহায্য ছাড়াই দেখতে পেলাম সবদিকের জানলা দিয়ে কয়েকশো গজ দূর পর্যন্ত। অসম্ভব, কল্পনাতীত, কিন্তু চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। আলোকময় হয়ে রয়েছে মহাসমুদ্রের একদম নিচের মেঝে।

মিনিট দুয়েক আমরা হতভম্ব হয়ে শুধু চেয়েছিলাম— মুখ দিয়ে বাক্য সরেনি। তার পরেই সোল্লাসে বলেছিলেন ম্যারাকট, 'হবেই তো! আগেই তো ভেবে রেখেছিলাম, দেখব এমন দৃশ্য। আলোকময় কাদা! অযুত বছর ধরে যা পচেছে, তা থেকে ফসফরাসের দ্যুতি বেরোচ্ছে! আহারে! এমন দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করেও বাইরের দুনিয়ায় সে সংবাদ পাঠাতে পারছি না।'

আমি বলেছিলাম, 'আধটন রেডিয়ো লেরিয়ান জেলি চেঁছে তুলেও কিন্তু এরকম দ্যুতি দেখা যায়নি— গভীর সমুদ্রের সিলিকা কঙ্কালদের গা থেকে দ্যুতি তো বেরোয়— কিন্তু এমনটা দেখলাম এই প্রথম।'

'এই আলো এতখানি সমুদ্রের জল ঠেলে ওপর পর্যন্ত পৌঁছাতে কি পারে? তাছাড়া, আধটন থেকে কতটুকু আশা করা যায়? এখানে যে দেখা যাচ্ছে, যতদূর দু-চোখ যায় শুধু পচা পাঁক। দেখুন, দেখুন,' সে কী উল্লাস ম্যারাকটের, 'মর্তের মাটিতে যেমন গরু ছাগল মোষ চরে বেড়ায়, সমুদ্রের তলার জমিতে তেমনি অতল সমুদ্রের প্রাণীরা দিব্বি চরে বেড়াচ্ছে! ঠিক যেন মাঠে ঘাস খাচ্ছে!'

কালচে রঙের মস্ত মাছের একটা ঝাঁক আস্তে আস্তে বিশাল চ্যাপটা বপু নিয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে স্পঞ্জের মতো সমুদ্রতলের বিবিধ বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে, আস্তে আস্তে লেজ নেড়ে নেড়ে সরে গেল তফাতে। তারপরেই এল একটা বিশাল লাল জীব, সমুদ্রের নির্বোধ গাভীর মতন, পোর্টহোলের সামনের আবর্জনা-কাদা চুষে নিয়ে সরে গেল তফাতে। এই রকম গবেট চেহারার আরও অনেক সমুদ্রবাসীদের দেখলাম আশপাশে, মাঝে মাঝে মাথা তুলে চেয়ে আছে হঠাৎ নেমে আসা অদ্ভুতাকৃতির এই ইস্পাত কক্ষের দিকে।

ম্যারাকটের প্রশংসা না করে পারছি না। ইস্পাতকক্ষের ভেতরকার অমন বদ আবহের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর সন্নিকটে থেকে বিজ্ঞানের পূজারী হয়ে রয়েছেন বিষম উল্লসিত মুখাবয়ব নিয়ে। ঝাঁ ঝাঁ করে লিখে যাচ্ছেন। নোটবুকের পাতায় পাতায় চোখে যা-যা দেখছেন, সে সবের নিখুঁত বিবরণ। উনি যা করছেন, তা সঠিক, আমি কিন্তু নিতান্ত বেঠিকভাবে দর্শনের অভিজ্ঞতাকে জমিয়ে রেখে দিলাম মগজের মধ্যে। তা সত্ত্বেও, যা দেখেছি, তা জীবনে ভুলব না। সমুদ্রের একদম নিচের প্রান্তরে থাকে লালচে কাদামাটি। কিন্তু এখানে দেখছি বহুদূরব্যাপী ধূসর প্রান্ত— যতদূর দু-চোখ যায়, ততদূর। প্রান্তর কিন্তু মসৃণ নয়, রয়েছে অসংখ্য গোলমতো টিলা— যে রকম একটা টিলার ওপর নেমে পড়েছি আমরা— প্রত্যেকটা টিলা থেকে ঠিকরে যাচ্ছে ভৌতিক দ্যুতি। ছোট ছোট এই টিলাদের মাঝ-মধ্যে দিয়ে খেলে খেলে যাচ্ছে অদ্ভুত মীন মহাশয়দের বিশাল বিশাল দঙ্গল— মেঘের মতো, যাদের বেশির ভাগ মর্তের বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা, যাদের গা থেকে ঠিকরে যাচ্ছে রকমারি রঙের দ্যুতি, বেশির ভাগই অবশ্য কালো আর লাল। অবদমিত উত্তেজনা নিয়ে ম্যারাকট তাদের অবলোকন করছেন আর হাই স্পিডে খুঁটিনাটি লিখতে লিখতে যাচ্ছেন।

বাতাস বদ হয়ে এসেছে অতি মাত্রায়, আর একটু অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে প্রাণগুলোকে ধরে রাখতে হল দেহপিঞ্জরের মধ্যে। আশ্চর্যের বিষয়, খুব খিদে পেয়েছিল। এই সময়ে রুটি মাংস মাখন পেটে চালান করলাম হুইস্কি আর জল দিয়ে। দূরদর্শী ম্যারাকট সবই এনেছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। চাঙ্গা হয়ে পোর্টহোলের সামনে বসে যখন ভাবছি, আহারে, এই সময়ে একটা সিগারেট পেলে মন্দ হত না— ঠিক তখন আমার চোখ আটকে গেল এমন একটা ব্যাপারে যা চিন্তার তুফান তুলে দিল মনের মধ্যে— সেই সঙ্গে অনেক অদ্ভুত কিছুর সম্ভাবনা।

আগেই বলেছি, ঢেউ খেলে যাওয়া বিশাল প্রান্তরের মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল অসংখ্য গোলমতো টিলা। বিশেষ একটা ছিল আমার পোর্টহোল থেকে তিরিশ ফুটের মধ্যে। গায়ে রয়েছে অদ্ভুত কতকগুলো দাগ। ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, দাগগুলোর পুনরাবির্ভাব ঘটেছে একইভাবে বারবার— শেষ পর্যন্ত চলে গেছে গোল টিলার কিনারা পর্যন্ত— তারপর আর দেখা যাচ্ছে না— রয়েছে দৃষ্টিপথের আড়ালে। মৃত্যুর সামনাসামনি এসে গেলে মাথা খেলে না, এমন কথা আমি হামেশাই শুনি। সেদিন কিন্তু অদ্ভুত দাগগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল— আরে! এ যে বাড়ির কার্নিশ! নানা রকম মূর্তি বসানো এই কার্নিশ তো এক সময়ে তৈরি হয়েছে মানুষেরই হাতে। ম্যারাকট দৌড়ে এলেন আমার পোর্টহোলের সামনে, ছুটে এল স্ক্যানলানও। বিষম বিস্ময়ে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন মনুষ্যকীর্তির সর্ববিদ্যমান স্বাক্ষরের দিকে।

স্ক্যানলান বলেছিল সল্লাসে, ‘কী আশ্চর্য! এ যে দেখছি খোদাই করা কারুকাজ! বাড়ির ছাদের আলসে! তাহলে আশপাশে যা দেখছি, সবগুলোই বাড়ি— যাচ্চলে! এ কী কাণ্ড!’

ম্যারাকট বললেন, ‘সত্যিই বটে। এসে পড়েছি এক প্রাচীন শহরে। ভূবিজ্ঞান বলে, সমুদ্র এক সময়ে মহাদেশ ছিল, মহাদেশ ছিল সমুদ্র। কিন্তু আটলান্টিকের জায়গায় এককালে যে একটা মহাদেশ ছিল, এ তত্ত্ব আমি কস্মিনকালেও বিশ্বাস করিনি। প্লেটো তাহলে ঠিকই বলেছেন। মিশরীয়দের গুজবে তাহলে সত্যি আছে। এই যে আগ্নেয় অঞ্চল এতক্ষণ দেখে এলাম এ সবই ভূকম্পের ফলে তলিয়ে যাওয়া অঞ্চল।’

আমি বললাম, ‘গম্বুজগুলোর মধ্যে একভাব দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট— একটা নিয়ম নিষ্ঠা— মাপ করা পদ্ধতি। আলাদা আলাদা বাড়ি নয়। মস্ত একটা অট্টালিকার ওপরকার অনেকগুলো গম্বুজ— ছাদের ওপরকার কারুকাজ।’

স্ক্যানলান বললে, ‘ঠিক বলেছেন। চারকোণে রয়েছে চারটে বড় গম্বুজ— এক এক দিকের দুটো বড় গম্বুজের মাঝখানে একটা করে ছোট গম্বুজ। বিরাট একটা বাড়ি-ই বটে, কপাল মন্দ— সমস্তটা দেখতে পাচ্ছি না! গোটা একটা কারখানাকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় ভেতরে! তবুও জায়গা থেকে যাবে!’

ম্যারাকট বললেন, ‘ওপর থেকে ক্রমাগত আবর্জনা পড়ার ফলে ছাদ পর্যন্ত ঢেকে গেছে। অথচ, নষ্ট হয়ে যায়নি। গভীর জলের টেম্পারেচার ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটের একটু ওপরে আটকে থাকে। কিছুই নষ্ট হয় না সেই কারণেই। কী আশ্চর্য! কার্নিশের নিচের ওই দাগানো জায়গাগুলো তো কারুকার্য নয়, উৎকীর্ণ লিপি!’

ঠিকই বলেছেন ম্যারাকট। একই প্রতীক বারে বারে দেখা যাচ্ছে নানা জায়গায়। নিশ্চয় কোনও প্রাচীন হরফ। লিপি। উনিই বলে গেলেন বিষম উত্তেজিত গলায়, ‘ফিনিসিয়ান প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আমার কিছু পড়াশুনো আছে। যা দেখছি, তার কিছু না কিছু মানে আছেই। প্রতীকগুলোকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। দেখছি, প্রাচীন যুগের ডুবে যাওয়া এক শহর— এই মহাজ্ঞান সঞ্চয় করে মরতে চলেছি তিনজনে। বিজ্ঞানের বই শেষ হোক এইখানেই, আর তো কিছু জানার নেই। এখন যত তাড়াতাড়ি পারি মরা যাক।’

সেই মুহূর্তটার বেশি বিলম্বও আর নেই। বদ্ধ বাতাস দূষিত হয়ে গেছে। সে বড় ভয়ানক অবস্থা। কার্বন উপাদানে ভারী হয়ে যাওয়ায় সেই চাপ ঠেলে অক্সিজেন নিজের পথ করে নিতে পারছে না। বেগ পাচ্ছে। টাটকা বাতাস যেন গিলে খেতে হচ্ছে, সোফার ওপর

দাঁড়িয়ে গিয়ে, কিন্তু পায়ের দিক থেকে দুর্গন্ধময় বাষ্প একটু একটু করে উঠে আসছে ওপর দিকে। ডক্টর ম্যারাকট হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিমায় দু-হাত বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে বসলেন। দুর্গন্ধময় বাষ্প স্ক্যানলানকে প্রায় মেরে এনেছে, নেতিয়ে পড়েছে মেঝের ওপর। আমার নিজের মাথা বনবন করে ঘুরছে বুকের ওপর, অসহ্য চাপ অনুভব করছি। চোখ মুদে ফেলেছি, জ্ঞান লোপ পেতে চলেছে খুবই তাড়াতাড়ি। তারপর একবার চোখ খুলেছিলাম শেষবারের মতো এই পৃথিবীটাকে দেখে নেওয়ার জন্যে, আর তখনই টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম তারস্বরে।

পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে চেয়ে আছে একটা মানব মুখ!
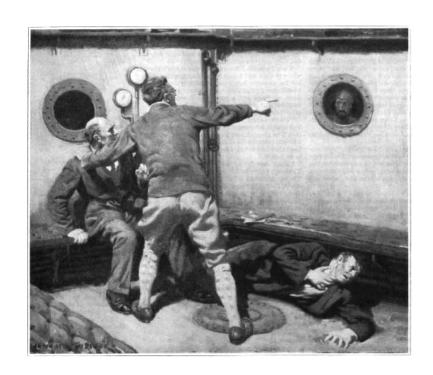
দুঃস্বপ্ন নাকি? ম্যারাকটের দু-কাঁধ খামচে ধরে সবেগে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিলাম। সোজা হয়ে বসে ফ্যালফ্যাল করে সবিস্ময়ে নির্বাক অবস্থায় প্রেতচ্ছায়ার দিকে উনি চেয়েছিলেন। উনি যখন দেখতে পেয়েছেন, তাহলে আমি যা দেখেছি, তা মনোবিকার নয়। ব্রেন বিগড়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়। মুখটা লম্বাটে আর শীর্ণ, গাঢ় রঙের, চিবুকে ছোট্ট ছুঁচোলো একটা দাড়ি, ঝকঝকে সঞ্চারমান দুটো চোখ চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে আমাদের

বেহাল দুর্গতির প্রতিটি খুঁটিনাটি। বিষম বিস্ময়ের বিস্ফোরণ দেখা যাচ্ছে সেই মানুষ মুখাবয়বে। ঘরের আলো তখন জ্বলছে পুরো মাত্রায়, সেই আলোয় নিশ্চয় দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্টভাবে ঘরের খুঁটিনাটি, একজন মেঝেতে এলিয়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে, জ্ঞান হারিয়েছে, বাকি দু-জন মৃত্যুর পথে পা দিয়ে মুখাবয়ব বিষম বিকৃত করে চেয়ে আছে— টাটকা বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছে। দু-জনেই গলায় হাত রেখে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছি— সময় ফুরিয়ে আসছে, মৃত্যুর আর দেরি নেই। লোকটা হাত নেড়ে কী একটা ইঙ্গিত করে সাঁৎ করে সরে গেল জানলার সামনে থেকে।

'পালিয়ে গেল!' ভাঙা গলায় বললেন ম্যারাকট।

'লোকজন ডাকতে গেল। স্ক্যানলানকে সোফায় শুইয়ে দেওয়া যাক। মেঝেতে শুয়ে মরবে কেন।'

দু-জনে মিলে টেনে হিঁচড়ে মেকানিক বিল স্ক্যানলানকে তুলে আনলাম সোফার ওপর— হেলিয়ে শুইয়ে রাখলাম মাথা। মুখ তার বর্ণহীন। প্রলাপ বকছে। নাড়ি কিন্তু চলছে।

ভাঙা গলায় বলেছিলাম, 'আশা আছে এখনও।'

'পাগলের মতো যা তা কী বকছেন!' চিৎকার করে উঠেছিলেন ম্যারাকট, 'সমুদ্রের একদম তলায় মানুষ বেঁচে থাকে নাকি? বাস করতে পারে? নিঃশ্বাস নেবে কী করে? আমরা দলগতভাবে মরীচিকা দর্শন করছি— ভ্রান্তি রোগে ভুগছি। মাই ইয়ং ফ্রেন্ড, আমরা সবাই পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

বিবর্ণ জনশূন্য ধূসর প্রান্তরের মলিন প্রেতলোকের দিকে চেয়ে থেকে আমারও তা-ই মনে হয়েছিল— মরণকালেও সঠিক কথা বলেছেন ম্যারাকট। নিশ্চয় উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি তিনজনেই। তারপরেই চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম একটা নড়াচড়া। দূরের জলের মধ্যে নড়ছে কতকগুলো ছায়া। আস্তে আস্তে নিরেট ঘন হয়ে গিয়ে কায়া পরিগ্রহ করল সেই ছায়ামূর্তিগুলো। সমুদ্রতল মাড়িয়ে একদল লোক ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ভীড় করে দাঁড়িয়ে গেল পোর্টহোলের সামনে, আমাদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে অঙ্গভঙ্গী করে কথা চালিয়ে গেল। দলটার মধ্যে মেয়েছেলে আছে জনাকয়েক, বেশিরভাগই পুরুষ, তাদের একজনের শরীর বেশ শক্তসমর্থ, মাথা বেশ বড়, গালে একমুখ দাড়ি, নিশ্চয় দলপতির মতো হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ইস্পাত কক্ষের ভেতরে আমাদের অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত করে নিল দ্রুত চোখ

চালিয়ে। যেহেতু আমাদের খাঁচা একটা ঠেলে বেরিয়ে আসা জায়গায় আটকে গিয়ে ঝুলছিল, তাই দেখতে পেয়েছিল খাঁচার তলার দিকে রয়েছে একটা তুলে খুলে ফেলা দরজা। একজন বার্তাবাহককে কী বলতেই সে দৌড়ে চলে গেল কিছু একটা করতে। দাড়িওয়ালা ব্যক্তিত্বময় পুরুষটা তখন হুকুমের ভঙ্গিতে আমাদের ইশারায় বললে, এক্ষুণি খোলা হোক পায়ের তলার টেনে তোলা দরজার পাল্লা।

আমি বলেছিলাম, 'খোলাই যাক। এমনিতেই তো সলিল সমাধি ঘটছে। সেটা ঘটুক পুরোপুরি।'

ম্যারাকট বললেন, 'সলিল সমাধি নাও ঘটতে পারে। ঘরের মধ্যে বাতাস তো চাপের মধ্যে রয়েছে। নিচ থেকে জল ঢুকলেও কিছুটা উঠে আটকে যাবে বাতাসের চাপে। স্ক্যানলানকে একটু ব্র্যান্ডি গিলিয়ে দিন। ওকেও তো হাত লাগাতে হবে।'

মেকানিকের গাল টিপে ধরে মুখ হাঁ করিয়ে গলায় ঢেলে দিলাম একটু ব্র্যান্ডি। মাথা চনমন করে উঠতেই চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগল চারপাশ। ধরাধরি করে বসিয়ে দিলাম সোফার ওপরে, দাঁড়ালাম দু-পাশে। যদিও তখনও ঘোরের মধ্যে রয়েছে, তা সত্ত্বেও কানের কাছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অল্প কথায় পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিলাম।

ম্যারাকট বললেন, 'জল যদি ব্যাটারিতে লাগে, তাহলে ক্লোরিন পয়জনিং এর সম্ভাবনা একটা আছে। বাতাসের সব ক-টা নল খুলে দিন যাতে চাপের চোটে কম জল ঢেকে ভেতরে। এবার হাত লাগান— হাতল ধরে টান মারছি।'

সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে তিনজনের ওজন এক করে হ্যাঁচকা টান মেরে আমাদের ছোট্ট ঘরের তলদেশ থেকে গোলাকার চাকতি সরিয়ে দিলাম— যদিও তখন মনে হয়েছিল সুইসাইড করতে যাচ্ছি। আলোর নিচে ফুঁসে তোড়ে ঢুকে পড়ল সবুজ জল হুশহুশ শব্দে। দ্রুত উঠে এল গোড়ালি ছাড়িয়ে হাঁটু পর্যন্ত, কোমর পর্যন্ত আটকে গেল সেখানেই। অসহ্য হয়ে উঠল কিন্তু বাতাসের চাপ। মাথা ঘুরতে লাগলো বোঁ বোঁ করে, মনে হল এই বুঝি ফেটে যাবে কানের পর্দা। বেশ বুঝলাম, এহেন পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারব না বেশিক্ষণ। তাক খামচে ধরেছিলাম বলেই হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাইনি পায়ের তলায় ফুঁসে উঠে আসা থই থই জলের মধ্যে।

উঁচু অবস্থানে থাকার দরুণ পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, বুঝতেও পারছিলাম না আমাদের উদ্ধারের জন্যে কী ব্যবস্থা নিতে চলেছে উদ্ধার কর্তারা।

উদ্ধার যে আদৌ পাব, এমন সম্ভাবনা মাথার মধ্যে ঠাঁই পাচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও বাইরের লোকগুলোর কর্তৃত্বময় উদ্দেশ্যমূলক আচরণ মনের মধ্যে আশাব্যঞ্জক আভাস দেখতে পাচ্ছিলাম— যদিও তা ক্ষীণ আশা ছাড়া কিছুই নয়। আচমকা দেখতে পেলাম পায়ের দিকের ফুটো দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে লোকটা, পরমুহূর্তেই উঠে এল ঘরের মধ্যে, সোফার কিনারায় দাঁড়িয়ে কৌতুকময় চোখে তাকিয়ে যেন চোখের ভাষা দিয়ে বলে গেল— যত্তসব মুর্খের দল! কী ভেবেছ? পটল তুলবে? আমরা থাকতে?'

আর ঠিক এই সময়ে ভারী আশ্চর্য একটা ব্যাপার আমার নজরে এল। যে লোকটার কথা বলছি, সে যদিও-বা আমাদের মতোই মনুষ্য গোত্রের জীব হয়, তার হাত আর পা ছাড়া বাকি দেহটা ঘিরে ছিল একটা স্বচ্ছ আবরণ— মাথা আর ধড় মুড়ে। জিনিসটা এমনই স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে তৈরি যে জলের মধ্যে থাকার দরুন এতক্ষণ বোঝা যায়নি, কিন্তু জল ঠেলে উঠে ইস্পাত কক্ষের মধ্যে আমাদের সামনে দাঁড়াতেই বোঝা যাচ্ছে— ঠিক যেন মিহি কাচ দিয়ে তৈরি একটা রুপোলি বস্তু। জিনিসটাকে দেখতে আয়তাকার বাক্সের মতো, গায়ে অনেক ছেঁদা যেন সামরিক অফিসারদের কাঁধের ওপরকার চাপরাশের মতো কিছু একটা গায়ে চাপিয়ে রেখেছে।

নবাগত বন্ধু আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতেই পায়ের তলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল আর একটা মুখ, ঠেলে তুলে দিল বিরাট বুদবুদের মতো কাচের মতো একটা বস্তু। এই রকম তিনটে বস্তু উঠে এল পরপর, ভাসতে লাগল ইস্পাত কক্ষের ভেতরে জমা জলের ওপর। তারপর ছ-টা ছোট বাক্স চালান করা হল নিচের ফুটো দিয়ে ভেতরের ঘরে। সদ্য পরিচিত ব্যক্তি আমাদের তিনজনের দু-কাঁধে আটকে দিল একটা করে, দেখে তখন মনে হল তাদের কাঁধের ওপরকার চাপরাশের মতো। একটু আগে থেকেই আমার মাথার মধ্যে একটা চিন্তার আনাগোনা শুরু হয়ে গেছিল। এই যে অদ্ভুত মানুষগুলো, এরা কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে অপ্রাকৃত পন্থায় জীবিত নয়, এক কাঁধের একটা বাক্স বাতাস উৎপাদন করে যাচ্ছে, আর এক কাঁধের একটা বাক্স বাতাস টেনে নিচ্ছে। ইলাসটিক ব্যান্ড দিয়ে টেনে আটকে দিল বাহুর ওপর দিকে আর কোমরের নিচে, যাতে আর জল ঢুকতে না পারে। ভেতরে থেকে স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে গেলাম। বিপুল হর্ষে মন নৃত্য করে উঠল যখন দেখলাম ম্যারাকট প্রফুল্ল বদনে চশমা চোখে চেয়ে আছেন আমার দিকে, বিল স্ক্যাননের দেঁতো হাসি দেখে বোঝ গেল প্রাণদায়ী অক্সিজেন তার ক্ষেত্রে কাজ দিচ্ছে,

আগের হাসিখুশি অবস্থায় ফিরে এসেছে। আমাদের উদ্ধারকর্তা একে একে আমাদের অবলোকন করে নিল হৃষ্টভাবে, তারপর হাতের ভঙ্গিমায় বললে পায়ের তলার ফুটো দিয়ে যেন বেরিয়ে আসি তার পেছন পেছন সমুদ্রের মধ্যে। ডজন খানেক হাত এগিয়ে এসে সাহায্য করেছিল আমাদের সে কাজে— পাঁকালো হড়হড়ে জমির ওপর প্রথম পা দিয়ে যাতে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি, তাই সব দিক থেকে হাত বাড়িয়ে ধরে রেখেছিল আমাদের।

বিস্ময়ের সেই প্রথম চমক আজও বিস্মৃত হইনি আমি। পাতাল সমুদ্রে পাঁচ মাইল নিচে দাঁড়িয়ে আছি আমরা তিন মূর্তি পরমানন্দে এবং বিপুল স্বচ্ছন্দে। বৈজ্ঞানিকদের কল্পনার সেই ভয়াল জলচাপ কোথায়? আশপাশ দিয়ে সুন্দর সুন্দর মাছগুলো অবহেলায় যেমন ঘুরেফিরে যাচ্ছে, আমরাও তো সেই রকম স্বচ্ছন্দ বোধ করছি। ধড়গুলোকে অবশ্য মুড়ে রেখে দিয়েছে ইস্পাতের চাইতেও মজবুত এই পাতলা আবরণ, কিন্তু হাত-পা তো বেরিয়ে রয়েছে— রয়েছে সামান্য চাপের মধ্যে, যা আর খেয়াল থাকে না কিছুক্ষণ পরেই। বড় ভালো লেগেছিল যে কক্ষের মধ্যে ছিলাম, সেই কক্ষের দিকে চেয়ে থাকবার সময়ে বাইরে থেকে। ব্যাটারিগুলো তখনও চালু থাকায় হলদেটে আলো ঠিকরে আসছে সব ক-টা জানলা দিয়ে, মাছের দঙ্গল খেলা করে যাচ্ছে প্রতিটা আলোকিত গবাক্ষের সামনে। দলপতি হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ম্যারাকট-কে, আমরা ভারি পদক্ষেপে অগ্রসর হলাম পেছন পেছন।

আর তার পরেই ঘটে গেল অতীব বিস্ময়কর একটা ব্যাপার। ব্যাপারটায় সমপরিমাণে বিস্মিত হয়েছিল আমাদের নতুন সহচররা। মাথার ওপরে দেখা গেছিল একটা ছোট্ট কালচে বস্তু। ওপরকার তমিস্রা ভেদ করে আস্তে আস্তে নেমে এসে কাদাটে জমিতে ঠেকে গিয়ে থেমে গেছিল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে সামান্য দূরে। স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ জল মাপছে সিসের গোলক নামিয়ে দিয়ে। ইস্পাত কক্ষের কর্ড ছিঁড়ে যাওয়ার পর আমরা যে অক্কা পেয়েছি, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার পর কর্তব্য করছেন ক্যাপ্টেন, সলিল সমাধি ঘটল যে জায়গায়, সে জায়গাটার গভীরতা মাপছেন। উনি কি ভেবেছিলেন, সিসের ওজনটা নেমে এসে থমকে যাবে আমাদেরই পায়ের গোড়ায়! মাথার ওপর দিকে উঠে গেছে টান টান পিয়ানো তার পাঁচ মাইল জলের মধ্যে দিয়ে জাহাজের ডেক পর্যন্ত। আহারে! এই তো সুযোগ। বার্তা পাঠানো যাক তারের সঙ্গে! আইডিয়াটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যে এখনও মরিনি, বহাল তবিয়তে আছি, এ খবরটা জাহাজের লোকদের জানিয়ে দেব না কেন? কাচের আবরণে আমার কোট ঢাকা থাকলেও ট্রাউজার্সের পকেট থেকে রুমাল বের করতে পেরেছিলাম। সেই রুমাল বেঁধে দিয়েছিলাম পিয়ানো তারে সিসের ওজনের ঠিক ওপরে। অটোমেটিক কলকবজা তক্ষুণি সিসের ওজনটাকে টেনে তুলে নিয়ে গেছিল মাথার ওপর দিকে, সেই সঙ্গে নড়তে নড়তে উঠে গেছিল আমার সাদা রুমাল— যে দুনিয়ার দিকে, সে দুনিয়া আর দেখতে পাব না কস্মিনকালে। আমাদের নতুন সঙ্গীরা সাগ্রহে চেয়ে রইলো পঁচাত্তর পাউন্ড ওজনের সিসেটার দিকে। তারপর ফের শুরু হল পথ পরিক্রমা।

খুদে পাহাড়ের মতো ঢিবিদের পাশ দিয়ে শ দুই গজ এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেছিলাম একটা চৌকোনা দরজার সামনে দু-পাশে রয়েছে নিরেট থাম আর কারুকাজ করা খিলেন। দরজা খোলা ছিল। আমরা ঢুকলাম ভেতরে একটা বড়সড় শূন্য কক্ষে। টেনে সরিয়ে আনা পার্টিশনের ব্যবস্থা ছিল ভেতর দিক থেকে। আমরা ভেতরে যেতেই একটা হাতলে চাপ দিতেই সেই পার্টিশন সরে এসে বন্ধ করে দিয়েছিল পেছনের দরজার মুখ। কাচের হেলমেটের মধ্যে কান থাকায় কিছুই শুনতে না পেলেও বুঝতে পারলাম। শক্তিশালী পাম্প ঘরের জল বের করে দিচ্ছে বাইরে, তাই জলের লেভেল হু-হু করে নেমে আসছে মাথার ওপর দিকে। পনেরো মিনিটও গেল না, দেখলাম দাঁড়িয়ে আছি একটা ঢালু পাথর দিয়ে বাঁধাই মেঝের ওপর। নতুন সঙ্গীরা হাতাহাতি করে আমাদের স্বচ্ছ পরিচ্ছদ খুলে দিচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই নিঃশ্বাসে খাঁটি বাতাস টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম প্রস্তর প্রকেষ্ঠের বিলক্ষণ উষ্ণ আলোকিত পরিবেশে— পাতালের ময়লা রঙের মানুষরা আমাদের ঘিরে ধরে খুশির হাসি হেসে হেসে কথা বলে গেল নিজেদের মধ্যে, বন্ধুর মতো আমাদের হাত ধরে নেড়ে দিয়ে পিঠ চাপড়ে দিল বিষম খুশিতে। কথা বলছিল অদ্ভুত রকমের উখো ঘষা গলায়, মানে বুঝতে পারছিলাম না কোনও কথার, কিন্তু চোখের চাহনি আর মুখভাবে বন্ধুত্বের আলো বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ভয় কী? আমরা তো আছি! সাগরতলের বন্ধুদের সেই মুখভাব আর আপনজনের মতো কথা বলা আমি বিস্মৃত হব না কোনও দিন।

কাচের পোশাকগুলো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল দেওয়ালের অনেকগুলো খোঁটায়। ঠেলে খুলে দেওয়া হয়েছিল ভেতরদিকের একটা দরজা— যে দরজার পরেই রয়েছে একটা টানা লম্বা গলিপথ। গলিপথে ঢুকে যেতেই পেছনের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর আর বুঝতেই পারলাম না আমরা রয়েছি পাঁচ মাইল সমুদ্রের নিচে এক অজানা মনুষ্য প্রজাতির অনাহুত অতিথি হয়ে, জলতলের ওপরের জগতের সঙ্গে নেই আমাদের আর কোনও সম্পর্ক।
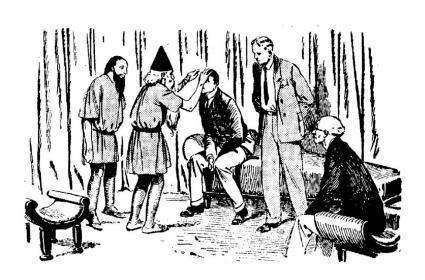
ভয়াবহ চাপ থেকে সহসা মুক্তি পাওয়ার পর আমরা সকলেই বিষম শ্রান্তিতে নেতিয়ে পড়েছিলাম। বিল স্ক্যানলানকে পকেট হারকিউলিস বলা যায়। সে পর্যন্ত পা টেনে টেনে চলছিল মেঝের ওপর দিয়ে। ম্যারাকট আর আমি দু-জনেই এলিয়ে পড়েছিলাম আমাদের গাইডদের গায়ের ওপর। শত ক্লান্তি সত্ত্বেও খুঁটিয়ে দেখে যাচ্ছিলাম আশপাশের সব কিছু। বাতাস আসছে নিশ্চয় বাতাস তৈরির কোনও মেশিন থেকে, কোনও সন্দেহই নেই তাতে

— কেননা সেই বাতাস হু হু করে বেরোচ্ছে দেওয়ালের গায়ের গোল গোল ফুটো থেকে। আলো স্তিমিত ফ্লোরেসেন্ট আলোর মতো যার উদ্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যেই মাথা ঘামিয়ে চলেছেন ইউরোপের ইঞ্জিনিয়াররা— ফিলামেন্টওলা ল্যাম্প যখন আর থাকবে না। গলিপথের কার্নিশের কাছে ঝোলানো সারবন্দি স্বচ্ছ কাচের লম্বাটে সিলিন্ডার থেকে এই আলো নেমে আসছে নিচের দিকে। এই পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে যাওয়ার পর ঢালুপথে আমাদের নেমে যাওয়া রুখে দিয়ে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটা বড়সড় বসবার ঘরে। মেঝেতে পাতা পুরু কার্পেট। চকচকে সোনালি চেয়ার আর সোনালি সোফা দিয়ে সাজানো— যা দেখেই আবছাভাবে মনের মধ্যে ভেসে উঠেছিল মিশরীয় কবরখানার ছবি। অত লোকজনদের বিদায় দিয়ে কাছে থেকেছিল সেই দাড়িওয়ালা লোকটা, আর দু-জন সহকর্মী। নিজের বুকে বার কয়েক টোকা মেরে দাড়িওলা বলেছিল 'ম্যান্ডা', বেশ কয়েকবার বলে আউড়ে গেছিল নিজের বুকে টোকা দিয়ে। তারপর একে একে আমাদের প্রত্যেকের দিকে ফিরে ম্যারাকট, হেডলে আর স্ক্যানলান নাম তিনটে বলে গেছিল বেশ কয়েকবার, উচ্চারণ সঠিক না হওয়া পর্যন্ত। তারপরে আমাদেরকে ইশারায় আসন গ্রহণ করতে বলে তিন সহকর্মীর প্রত্যেককে বলেছিল একটা করে কথা, তারা বেরিয়ে গেছিল ঘর থেকে, একটু পরেই সসম্ভ্রমে নিয়ে এসেছিল অতি বৃদ্ধ এক ভদ্রলোককে, যাঁর সাদা চুল দাড়ি লুটিয়ে পড়ছে বুক পিঠের ওপর, মাথায় রয়েছে অদ্ভুত শঙ্কুর মতো কালচে টুপি। আগেই আমার বলা উচিত ছিল, বাকি সবারই পরনে রয়েছে রঙিন রোমান পরিচ্ছদ, হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো, পায়ে রয়েছে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু মাছের চামড়া অথবা শ্যাগ্রিন চামড়ার হাই বুট। শ্রদ্ধেয় নবাগত নিঃসন্দেহে পেশায় চিকিৎসক, কেননা আমাদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, প্রত্যেকের কপালে হাত রেখে চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ ধরে, যেন আমাদের অবস্থার মানসিক ছবি নেওয়ার চেষ্টা করছেন। দেখে তো মনে হল, খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না, কেননা মাথা নাড়তে নাড়তে গম্ভীর গলায় কয়েকটা কথা বললেন ম্যান্ডা-কে। শুনেই, ম্যান্ডা একজন সহকর্মীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাইরে। সে ফিরে এসেছিল ট্রে ভরতি খাবার আর এক ফ্লাক্স সুরা নিয়ে। নামিয়ে রেখেছিল আমাদের সামনে। জিনিসগুলো যে আদতে কী, সে প্রশ্ন করবার শারীরিক শক্তি ছিল না কারুরই। বেদম অবস্থায় আহার সাঙ্গ করে অনেকটা সুস্থ বোধ করেছিলাম। তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর একটা ঘরে, যেখানে পাতা ছিল তিনটে বিছানা,

একটায় আমি ধপাস করে শুয়ে পড়েছিলাম তৎক্ষণাৎ। ক্ষীণভাবে মনে আছে বিল স্ক্যানলান আমার পাশে এসে বসেছে।

বলছে, 'ব্রান্ডিটা খেয়ে বাঁচলাম। কিন্তু এলাম কোথায়?'

'আপনি যা জানেন, আমিও তা জানি— তার বেশি নয়!' ঘুমন্ত চোখে নিজের বিছানার দিকে যেতে যেতে কী যে বিড়বিড় করে বলে গেল বিল স্ক্যানলান— তা আর মাথায় ঢোকেনি, কেননা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অঘোরে।

(৩)

ঘুম ভাঙবার পর মনে হয়েছিল যেন জ্ঞানহীন অবস্থা থেকে সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। কোথায় যে রয়েছি, এই ধারণাটাই প্রথমে আনতে পারিনি কল্পনার মধ্যে। গতদিনের ঘটনাগুলোকে মনে হচ্ছিল সারবন্দি আবছা ঘটনার ছায়া, প্রকৃত ঘটনা হিসেবে মন মেনে নিতে চাইছিল না কিছুতেই। ফ্যালফ্যাল করে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে ছিলাম জানলাবিহীন মস্ত ঘরটার ম্যাড়মেড়ে রঙের দেওয়ালগুলোর দিকে, কার্নিশের কাছ থেকে ঠিকরে আসা কম্পমান বেগুনি আলোক ধারার দিকে, ইতস্তত ছড়ানো আসবাবপত্রের দিকে, সবশেষে অন্য দুটো বিছানার দিকে— যে দুটোর একটা থেকে ভেসে আসছিল কেঁপে কেঁপে ওঠা অদ্ভুত নাক ডাকার শব্দ— সে শব্দ যে ম্যারাকটের, সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল 'স্ট্র্যাটফোর্ড' জাহাজে থাকবার সময়েই। সবই যেন অতিশয় কিম্ভূতকিমাকার মনে হয়েছিল, যেন সত্যি হতে পারে না কিছুতেই, যাচাই করে নেওয়ার জন্যে বিছানার চাদর খামচে ধরে লক্ষ করলাম চাদরের কাপড় কোনও সমুদ্র উদ্ভিদের শুকনো তন্তু বুনে তৈরি হয়েছে। হাড়েহাড়ে টের পেলাম সত্যিই কল্পনাতীত এক অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে এসে পড়েছি। ব্যাপারটা নিয়ে যখন মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করছি, তখন অট্টহাসির উচ্চকিত বিস্ফোরণ ত্যাগ করে শয্যায় উঠে বসল বিল স্ক্যানলান।

আমার ঘুম ভেঙেছে দেখে শুষ্ক কাষ্ঠহাসির ফাঁকে ফাঁকে বললে, 'মর্নিং, বো।'

চিবিয়ে চিবিয়ে জবাবটা দিলাম, 'খুব মেজাজে আছেন দেখছি। এত হাসির কী আছে?'

'প্রথমে আপনার মতো আমিও ভড়কে গেছিলাম, তারপর মাথায় এল খাসা একটা আইডিয়া। হাসিটা সেই কারণেই।'

'আইডিয়াটা কী?'

'ওই যে সিসের ওজনটা জলের গভীরতা মাপতে নেমে এসেছিল, ওই দড়িতে নিজেদেরকে বেঁধে দিলেই তো পারতাম। ওই যে সব কাচের ছদ্মবেশগুলো পরিয়ে দিয়েছিল, ওই সবের মধ্যেই তো নিঃশ্বেস নিয়ে যেতে পারতাম। বুড়ো ক্যাপ্টেন হোয়ি রেলিং ধরে ডেক থেকে হেঁট হয়ে দেখত, দড়িতে বাঁধা তিনখানা বান্ডিল উঠে আসছে জল থেকে। হাঃ হাঃ হাঃ!'

হেসেছিলাম আমিও। দু-জনের হাসির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছিল ডক্টরের। চোখে মুখে বেশ খানিকটা বিমূঢ় ভাব নিয়ে উঠে বসেছিলেন বিছানায়— ঠিক এই রকম বিমূঢ়তা দেখিয়েছিলাম আমি নিজেও চোখ মেলবার সঙ্গে সঙ্গে। নিজের বেহাল অবস্থা ভুলে গিয়ে বেশ মজার সঙ্গে শুনে গেছিলাম তাঁর ছাড়া ছাড়া মন্তব্য— কখনও উল্লসিত, কখনও বিমর্ষ... উল্লসিত এমন সুগভীর পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়ায়... বিমর্ষ এই বার্তা মর্তের বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিকদের কাছে পাঠানোর সুযোগ না থাকায়— যা কিনা এই মুহূর্তে খুবই দরকার।

নিজের ঘড়ির দিকে নেত্রপাত করে বললেন, 'এখন বাজে ন-টা। কিন্তু রাত ন-টা, না দিন ন-টা সেটা বোঝা যাচ্ছে না।'

তারপরেই বললেন, 'নিজেদের ক্যালেন্ডারের হিসেব রাখতে হবে এখন থেকে। অবতরণ করেছিলাম তেসরা অক্টোবর। এখানে পৌঁছেছিলাম সেই দিনই সন্ধে নাগাদ। ঘুমিয়েছি তাহলে কতক্ষণ?'

স্ক্যানলান বললে সকৌতুকে, 'মাসখানেক বলেই তো মনে হচ্ছে।'

সভ্য ভব্য থাকার জন্যে হাতের কাছে যা-যা মজুদ ছিল, তা-ই দিয়ে মুখ-টুখ ধুয়ে ফিটফাট হয়ে নিলাম। দরজা কিন্তু বন্ধই রইল। বেশ বুঝলাম, আপাতত আমরা সবাই কয়েদখানায় আছি। বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে কি না বোঝা না গেলেও, বাতাস কিন্তু সুখাবহ। একটু পরেই লক্ষ করলাম, বাতাস আসছে দেওয়ালের অনেকগুলো ছোট ছোট ফুটোর মধ্যে দিয়ে। পুরো জায়গাটা উষ্ণ রাখবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নিশ্চয় কোথাও আছে, যদিও স্টোভ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু টেম্পারেচার বেশ সুখাবহ। একটু পরেই দরজার ওপর দেখলাম একটা উঁচু বোতাম। টিপে ধরতেই হলুদ রঙের জামাকাপড় পরা কালচে চেহারার একটা লোক ফোকর পথে দেখা দিল। তার বড় বড় চোখের রং বাদামি, সে চোখে ভাসছে আপন করে নেওয়া চাহনি। চেয়ে রইল আমাদের দিকে নির্নিমেষে।

ম্যারাকট বললেন, 'আমাদের খিদে পেয়েছে। খাবারদাবার কিছু আনা যাবে?'

মাথা নেড়ে হাসল লোকটা। বেশ বোঝা গেল, শব্দগুলোর মানে বুঝতে পারেনি।

স্ক্যানলান তখন চালিয়ে গেল ওর আমেরিকান স্ল্যাং। প্রত্যুত্তরে দেখলাম সেই নীরব হাসি। কিন্তু আমি যখন হাঁ করে আঙুল দিয়ে মুখের ভেতরটা দেখালাম, লোকটা সজোরে মাথা নেড়ে ত্বরিত পদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দশ মিনিট পরেই খুলে গেল দরজা। হলদেটে চামড়ার দু-জন পরিচারক এল ঘরের মধ্যে। ঠেলে নিয়ে এল একটা টেবিল। বাল্টিমোর হোটেলে বসেও এমন খানা পেতাম কি না সন্দেহ। কফি, গরম দুধ, রোল, সুস্বাদু চ্যাপটা মাছ, আর মধু। আধঘণ্টা মুখে কথা না বলে হাত চালিয়ে গেলাম। আধঘণ্টা পরে ফের এল পরিচারক দু-জন, ট্রে সমেত টেবিল ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, সন্তর্পণে বন্ধ করে দিল দরজা।

স্ক্যানলান বললে, 'চিমটি কেটে কেটে নিজের গাল নীল আর কালো করে ফেলেও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কী! স্বপ্ন দেখছি নাকি? ডক্টর, আপনি যখন আমাদের নিয়ে এসেছেন, তখন আপনিই বলুন, এ সবের মানে কী?'

মাথা নাড়তে নাড়তে ডক্টর বললেন, 'মনে তো হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। তবে বড় মধুর স্বপ্ন! বড় সোনালি স্বপ্ন! মর্তের মানুষদের কাছে যদি পৌঁছে দিতে পারতাম এখানকার এই কাহিনি, তাহলে চক্ষুস্থির হয়ে যেত জগৎ জনের।'

আমি বললাম, 'একটা ব্যাপার কিন্তু বিলকুল পরিস্কার, আন্টলান্টিক নিয়ে কিংবদন্তী তাহলে কুহক কল্পনা নয়— আদতে সত্যি আছে। সেই মহাদেশেরই কিছু মানুষ চমকপ্রদ কোনও পন্থায় সমুদ্রের তলায় বসবাসের উপযোগী করে নিয়েছে নিজেদের।'

বুলেট মাথা চুলকোতে চুলকোতে বিল স্ক্যানলান বলেছিল, 'তা-ই যদি হয়, বুঝতে পারছি না বাতাস, টাটকা জল আর এলাহি বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছে কেমন করে। দাড়িওয়ালা যাকে গতকাল দেখেছিলাম, সে এলে ফয়সালা হতে পারে এই রহস্যের।'

'কিন্তু সেটা হবে কী করে? ভাষা তো আলাদা।'

ম্যারাকট বললেন, 'নিজেরাই বরং পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাই। একটা ব্যাপার এর মধ্যেই বোঝা হয়ে গেছে। বুঝলাম ব্রেকফাস্টের মধু থেকে। সংশ্লেষিত মধু নিঃসন্দেহে মৌচাকের খাঁটি মধু নয়। সিন্থেটিক মধু বানানোর কায়দা তো মর্তের মানুষও শিখে গেছে। সিন্থেটিক মধু যদি বানানো হয়, তাহলে সিন্থেটিক কফি আর ময়দাই বা বানানো যাবে না কেন? মৌল পদার্থের মলিকিউলগুলোতো ইটের মতো, আর এরকম ইট ছড়ানো রয়েছে আমাদের চতুর্দিকে। শুধু জানতে হবে বিশেষ ইটদের বের করা যায় কী করে— কখনও কখনও একটা মাত্র ইটকে— টাটকা বস্তু বানানোর জন্যে। চিনি স্টার্চ হয়ে যাচ্ছে, অথবা অ্যালকোহল হয়ে যাচ্ছে তো শুধু এই ইটদের নড়ানো সরানোর ফলে। কিন্তু তাদের নড়াচ্ছে কোন শক্তি? তাপ, বিদ্যুৎ! হয়তো আছে আরও অনেক কিছু যা আমাদের জানা

নেই। তাদেরই কেউ কেউ নিজেরাই নড়ে সরে যায়, রেডিয়াম হয়ে যায় সিসে, অথবা ইউরেনিয়াম হয়ে যায় রেডিয়াম— তাদেরকে না ছুঁয়েই।'

'বলতে চান, এরা তাহলে এগিয়ে থাকা রসায়ন বিদ্যা রপ্ত করেছে?'

'আমি অন্তত সুনিশ্চিত সে ব্যাপারে। অবশ্যই সব রকমের মৌলিক পদার্থ রয়েছে এদের ভাঁড়ারে। অজানা নয় কিছু। সাগরের জল থেকে সহজেই পেয়ে যাচ্ছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। সামুদ্রিক উদ্ভিদ দুনিয়ায় রয়েছে দেদার নাইট্রোজেন আর কার্বন। গভীর সমুদ্রের তলানি খনিতে রয়েছে প্রচুর ফসফরাস আর ক্যালসিয়াম। পর্যাপ্ত জ্ঞান আর দক্ষ পরিচালনা থাকলে এসব থেকে কী না বানানো যায়?'

এই বলে যখন কেমিক্যাল লেকচার শুরু করেছেন ডক্টর, দরজা খুলে গেল সেই সময়ে, ঘরে ঢুকল ম্যান্ডা, মুখমন্ডলে বন্ধুত্বসূচক আপ্যায়ন ভঙ্গিমা। তার সঙ্গে এল সম্মানিত চেহারার সেই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি— যাকে দেখেছিলাম আগের রাতে। নিশ্চয় বিদগ্ধ পুরুষ! কেননা, বেশ কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করে মহড়া দিয়ে গেল— যদি আমরা বুঝতে পারি। নিশ্চয় বিভিন্ন ভাষা, কিন্তু কোনওটারই মাথামুণ্ড কিসসু বুঝতে পারলাম না। বয়োবৃদ্ধ পুরুষ তখন মাথা নেড়ে কথা বলে গেল ম্যান্ডা-র সঙ্গে। ম্যান্ডা হুকুম দিল হলুদ পোশাক পরা দুই পরিচারককে। দু-জনেই তখনও দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। দু-জনেই অদৃশ্য হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ, একটু পরেই ফিরে এল অদ্ভুতদর্শন একটা স্ক্রিন নিয়ে— দু-পাশে দুটো খুঁটির ওপর খাড়া করা অবস্থায়। দেখতে অবিকল আমাদের সিনেমার পর্দার মতো, কিন্তু ওপরে রয়েছে ঝিকিমিকি একটা পদার্থের প্রলেপ, আলো পড়লেই ঝিকমিক চিকমিক করছে। জিনিসটাকে রাখা হল একটা দেওয়ালের গা ঘেঁষে। বৃদ্ধ তখন মেপে মেপে পা ফেলে পেছিয়ে এল একটু পর্দার সামনে থেকে, দাগিয়ে দিল সেখানকার মেঝে। ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ম্যারাকটের দিকে ফিরে কপালে হাত রেখে আঙুল তুলে দেখাল পর্দা।

স্ক্যানলান বললে, 'যাচ্চলে! এটা আবার কী মশকরা?'

ম্যারাকট মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আমাদের প্রত্যেকের হতভম্ব থতমত অবস্থাটা। একই অবস্থা চকিতের জন্যে দেখা গেল বৃদ্ধের মুখাবয়বে। মাথায় খেলে গেল একটা আইডিয়া! আঙুল তুলে দেখাল নিজেকে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল পর্দার দিকে, স্থির চোখে চেয়ে রইল সেইদিকে। মুহূর্তমধ্যে তার প্রতিফলন দেখা গেল আমাদের সামনেকার স্ক্রিনে। তারপরেই আঙুল তুলে দেখাল আমাদেরকে, এক লহমা যেতে না যেতেই তার প্রতিচ্ছবির

জায়গায় এসে গেল আমাদের সকলের প্রতিচ্ছবি। হুবহু আমাদের মতো নয়। স্ক্যানলানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম কমিক চিনেম্যানের মতে, ম্যারাকটকে বিশীর্ণ পচনপ্রাপ্ত মড়ার মতো, কিন্তু আমরাই বটে, অপারেটরের চোখে যেমন আমরা— তেমনি।

সবিস্ময়ে বলেছিলাম, 'চিন্তার প্রতিফলন?'

'তা-ই বটে,' বললেন ম্যারাকট, 'আশ্চর্য আবিষ্কার— পিলে চমকে দেওয়ার মতো! টেলিপ্যাথি আর টেলিভিশনের কম্বিনেশন— পৃথিবীতে যা নিয়ে ভাবনা চলছে আবছাভাবে।'

স্ক্যানলান বললে, 'সিনেমায় আমাকে এই রকম দেখায় নাকি? কী আশ্চর্য! 'লেজার' দৈনিকের সম্পাদকের কানে খবরটা পৌঁছে দিতে যদি পারি, তাহলে বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। যদি এখান থেকে বেরোতে পারি।'

'মুশকিলটা সেইখানেই,' বলেছিলাম আমি, 'গোটা দুনিয়াকে ঝাঁকিয়ে দেওয়া যেত শুধু এই একখানা খবর বাজারে ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু ইশারা করছে কেন? কী বলতে চায়?'

'ডক্টর, আপনাকে দিয়ে ট্রায়াল দিতে চায় বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক।'

ম্যারাকট তক্ষুণি গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন দেখিয়ে দেওয়া জায়গায়। তাঁর শক্তিশালী মগজ চিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন জাগ্রত হল স্ক্রিনের ওপর। আমরা দেখলাম ম্যান্ডা-কে, তারপরেই দেখলাম 'স্ট্র্যাটফোর্ড' জাহাজকে— যে অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলাম, সেইভাবে।

ম্যান্ডা আর বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক দু-জনেই বিষম সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে গেল জাহাজের ছবি দেখবার পর, ম্যান্ডা দ্রুত ভঙ্গিমায় হস্ত সঞ্চালন করে প্রথমে দেখাল আমাদের কে, তারপর পর্দার দিকে।

সোল্লাসে বলেছিলাম আমি, 'বুঝলেন কী বলতে চায়? যা বলতে চান, সব বলে যান। গুড আইডিয়া! ছবির মাধ্যমে জানতে চায় আমরা কে, এ চুলোয় এলাম কী করে?'

ম্যারাকট ঘাড় দুলিয়ে ম্যান্ডা-কে বুঝিয়ে দিল, অনুরোধটা তাঁর মাথায় ঢুকছে, বক্তব্য বোধগম্য হচ্ছে। সমুদ্র যাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণ প্রক্ষেপণ করতে যখন শুরু করেছিলেন, হাত তুলে ম্যান্ডা তাঁকে আটকে দিল। হুকুম দিতেই দুই পরিচারক সরিয়ে নিয়ে গেল স্ক্রিনটা, তারপরেই আটলান্টিসবাসী দু-জন ইশারায় আমাদেরকে বললে তাদের পেছন পেছন আসা হোক।

বাড়িটা বিরাট। গলিপথের পর গলিপথ পেরিয়ে গেলাম, এসে গেলাম প্রকাণ্ড একটা হল ঘরে, ধাপে ধাপে সাজানো আসন— যেমনটা থাকে লেকচার কক্ষে। একদিকে রয়েছে

একটা বড় স্ক্রিন, যেরকম স্ক্রিন একটু আগে দেখেছি, সেই রকম। স্ক্রিনের দিকে মুখ করে গ্যালারিতে বসে আছে কমসে-কম এক হাজার মানুষ, আমরা ঘরে ঢুকতেই অভিনন্দন জানালো মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি দিয়ে। স্ত্রী আর পুরুষ উভয়ই আছে সেই সম্মেলনে, সব রকম বয়সের, পুরুষদের গায়ের রং গাঢ়, গালে দাড়ি; মেয়েরা সুন্দরী, বয়স যাদের একটু বেশি তাদের চোখে মুখে চাপা গাম্ভীর্য। এদের সবাইকে খুঁটিয়ে দেখবার সময় পেলাম না আমাদেরকে ঝটপট সামনের সারির আসনে বসিয়ে দেওয়ায়, তারপর ম্যারাকটকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল স্ক্রিনের সামনে। বিশেষ এক কায়দায় কমিয়ে দেওয়া হল আলোর তেজ, তারপরেই ওঁকে সংকেতে বুঝিয়ে দেওয়া হল— এবার শুরু হোক চিন্তা প্রক্ষেপণ।

দারুণভাবে সেই কর্মটি করে গেলেন ম্যারাকট। ব্রেন বটে একখানা। প্রথমে দেখলাম, টেমস নদী থেকে রওনা হয়েছে আমাদের জাহাজ, সত্যিকারের আধুনিক লন্ডন শহরের ছবি দেখে গুঞ্জন ধ্বনিতে ঘর ভরিয়ে তুলল দর্শকবৃন্দ— যারা ভীষণ উদ্বেগে কাঠ হয়ে বসেছিল এতক্ষণ। তারপরেই দেখা গেল একটা মানচিত্র— কোন কোন পথ দিয়ে এগিয়েছে জাহাজ। তারপরেই দেখা গেল বিবিধ কলকবজা লাগানো ইস্পাত কক্ষ— দেখেই গুঞ্জন মারফত দর্শকরা বুঝিয়ে দিল, জিনিসটাকে তারা চিনতে পেরেছে। ফের দেখতে পেলাম আমাদের জলে নামবার অভিযান, পৌঁছেছি খাদের একদম কিনারায়। তারপরেই দেখা গেল বিশাল কলেবরের সেই দানবটাকে যে আমাদের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। দর্শকরা তাকে দেখেই 'ম্যারাক্স! ম্যারাক্স!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। বুঝলাম, অতিকায় এবং নৃশংস দানবের সঙ্গে তাদের পূর্ব পরিচয় আছে। ভয় পায় বিলক্ষণ। আমাদের কাছি নিয়ে দানবটার টানাটানি পর্ব শুরু হতেই আতঙ্কের গুঞ্জন জাগ্রত হল বিরাট হল ঘরে। আতঙ্ক গুঞ্জন বেড়ে গেল কাছি ছিঁড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইস্পাত কক্ষ তলিয়ে যাচ্ছে অতলে। পরবর্তী আধঘণ্টায় যা দেখানো হয়ে গেল, তা মুখে বলতে গেলে পুরো একটা মাস সময় লাগত। ব্রেনের ছবি তথা মনের ছবি দেখানো সাঙ্গ হতেই সমবেত দর্শকরা সহানুভূতির গুঞ্জন ছড়িয়ে ঘিরে ধরল আমাদের, পিঠ চাপড়ে স্বাগতম জানাল। আমাদের হাজির করা হল জনাকয়েক দলপতির কাছে। দেখেশুনে বুঝলাম জ্ঞানবৃদ্ধ তাপসিক যারা, দলপতি হবার অধিকার আছে শুধু তাদেরই। জ্ঞানের জোরে বড়, গায়ের জোরে নয়। প্রত্যেকেই একই সামাজিক মাপকাঠির মানুষ, পোশাক পরিচ্ছদও একই

রকমের। পুরুষদের শ্রীঅঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো গেরুয়া আলখাল্লা, কোমরে বেল্ট পায়ের উঁচু বুট কোনও সামুদ্রিক জীবের শক্ত চামড়া দিয়ে তৈরি। মেয়েদের পোশাকের ছাঁটকাট সুন্দর— সেকেলে স্টাইলে। লুটিয়ে পড়া পরিচ্ছদ গোলাপি, নীল, সবুজ রঙের, মুক্তো অথবা অস্বচ্ছ ঝিনুকের কারুকাজের ফলে বেশ নয়ন সুন্দর। বেশিরভাগ মেয়েদের লাবণ্য পৃথিবীর মেয়েদের রূপলাবণ্যের চেয়ে ঢের বেশি, বিশেষ করে একজনের। কিন্তু... জনসমক্ষে আমার এই ধারাবিবরণী পেশ করতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার তার মধ্যে মিশিয়ে ফেলছি কেন? যার কথা বলছিলাম, তার নাম মোনা, ম্যান্ডা-র একমাত্র কন্যা, প্রথমদিনের সেই পরিচয়ের মুহূর্তেই তার দু-চোখে যে প্রশংসা, সমবেদনা এবং মনপ্রাণ দিয়ে আমাদের দুর্দশা আর ভোগান্তি অনুভব করার ছাপ দেখেছি, তা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছিল, কৃতজ্ঞতায় মন আমার টইটুম্বুর হয়ে গেছিল। সর্বসেরা এই লেডি সম্পর্কে বেশি কথা এখন আমি বলতে চাই না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে— আমার সারা জীবনে খুবই জোরদার আর নতুন ধরনের একটা প্রভাব এসে পড়েছিল এর পর থেকেই। আমাদের এহেন বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্যেও যে একটা মনোরম ভাব থেকে গেছে, তা বুঝতে পারছিলাম, যখন দেখছিলাম বিশেষ এক মহীয়সী মহিলার সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে কথা বলার চেষ্টা করছেন ম্যারাকট, আর একদল হাস্যমুখরা মেয়েদের মাঝে বিষমভাবে মূক অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে বিল স্ক্যানলান। ট্র্যাজেডির মধ্যে সে এক বিচিত্র কমেডি! মর্ত জগতে আমরা মৃত হয়ে যেতে পারি, কিন্তু পাতাল জগতে আমরা যে পরিমাণে অভিনন্দিত হয়েছিলাম গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারের পুরস্কার স্বরূপ, তাতেই ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে যাওয়ায় আমাদের মন মেজাজ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল।

সেইদিনই একটু বেলার দিকে ম্যান্ডা আর অন্যান্য বন্ধুবর্গ আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল সুবিশাল ইমারতের নানান অংশ। সমুদ্রতলে সেই ইমারত এমনভাবে গেঁথে বসে গেছে যে তার ভেতরে ঢুকতে হয় ছাদের দরজা দিয়ে, সেখান থেকে অজস্র অলিগলি দিয়ে নেমে আসতে হয় একদম নিচের তলার মূল প্রবেশ পথের মস্ত ঘরটার মধ্যে। মেঝের ওপরেও চালানো হয়েছে বিস্তর খনন কার্য, তাই দেখতে পেলাম সব দিকের অলিগলিই ঢালু হয়ে নেমে গেছে পৃথিবীর গর্ভে— পাতালে। বাতাস তৈরির মেশিন দেখানো হয়েছিল আমাদের, যে বাতাসকে পাম্পের সাহায্যে চালান করা হচ্ছে ইমারতের সর্বত্র। ম্যারাকট ভীষণ বিস্মিত হয়েছিলেন, প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন অক্সিজেনের সঙ্গে

নাইট্রোজেনকে মিশিয়ে দেওয়ার অভিনব যন্ত্রপাতি দেখে, অবাক হয়েছিলেন ছোটখাটো কলকবজার মধ্যে দিয়ে কীভাবে যাচ্ছে অন্যান্য গ্যাস, বাতাসের অন্যান্য উপাদান— আরগন, নিয়ন, ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবস্থা প্রকরণ দেখে। সেসব গ্যাস এমনই যাদের নামটুকুই শুধু জেনেছে মর্তের মানুষ, তাদের হালচাল এখনও বুঝে ওঠেনি। সুপেয় জল পাতিত অর্থাৎ ডিসটিল করার প্রকরণ দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। সুবিশাল বৈদ্যুতিক কলকবজা দেখে চক্ষু ছানাবড়া করে ফেলেছিলেন। এ ছাড়াও রয়েছে আরও অনেক যন্ত্রপাতি— যা এতই জটিল আর সূক্ষ্ম যে বিশদ ব্যাপারটা মাথায় ঢোকাতে অক্ষম হয়েছি। আমি যেটুকু বুঝেছি চোখে দেখে আর জিভ দিয়ে চেখে, তা এই : বিপুল জটিল এই সব কলকবজার মধ্যে দিয়ে তরল, গ্যাসীয় উপাদানরা ছুটোছুটি করছে। তাপ, চাপ আর বিদ্যুৎ প্রবাহের মধ্যে দিয়ে এবং বানিয়ে দিচ্ছে ময়দা, চা, কফি অথবা সুপেয় সুরা।

একটা প্রতীতি সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত হয়ে গেছিল আমার মনের মধ্যে এইসব এলাহি কাণ্ডকারখানা দেখবার পর। সমুদ্রের তলায় প্রবেশ ঘটার ব্যাপারটা এখানকার প্রাচীন মানুষরা অবধাবন করেছিল অনেক আগে থেকেই, প্রস্তুতিও নিয়েছিল সেইভাবে। জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ার অনেক আগেই আটঘাট বাঁধা হয়ে গেছিল। বিশালকায় এই ইমারতটাকেই তো নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে জলতলে দিব্বি থেকে যেতে পারে। বিশাল বিশাল আধার, বানানো হয়েছে বাতাস, খাবার আর পানীয় জল সঞ্চয়ের পরিকল্পনা নিয়ে। আরও অনেক দরকারি জিনিস মজুদ রাখবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে নানাভাবে। সবই তৈরি হয়েছে দেওয়ালের মধ্যে ইমারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে। ঠিক একইভাবে নির্মিত হয়েছে বাইরে যাওয়ার দরজা, সিলিকা দিয়ে তৈরি মুখোশ আর গাত্রাবরণ, জল নিয়ন্ত্রণের বিশাল পাম্প। আসন্ন বিপর্যয়ের সংকেত বহু আগেই পেয়েছিল দূর অতীতের সেই বিপুল শক্তিধর মহামানবরা— যাদের এক হাত প্রসারিত ছিল মধ্য আমেরিকা পর্যন্ত, আর এক হাত মিশর পর্যন্ত— সেইসব জায়গাতেই রেখে গেছে তাদের কৃষ্টি আর সংস্কৃতির কিছু কিছু ছাপ— নিজেদের দেশটা কিন্তু তলিয়ে গেছে আটলান্টিকের অতলে। তাদেরই বংশধরেরা আজও রয়েছে সাগরের অতলের এই সাম্রাজ্যে, খুব সম্ভব অতটা মহীয়ান হতে না পেরে, বেশ কিছুটা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় পতনের পথে গড়িয়ে গিয়ে, যা খুবই স্বাভাবিক, তারপরে অবশ্য স্খলন রোধ করে ধরে রাখতে পেরেছে দূর অতীতের প্রবুদ্ধ পূর্বপুরুষদের কিছুটা জ্ঞান আর বিজ্ঞান— নতুন করে তাতে সংযোজন করার মতো এনার্জি আর না

থাকায়। যারা এখন থেকে গেছে, সেই উত্তর পুরুষদের মধ্যে অত্যাশ্চর্য শক্তি, বংশ পরম্পরায় পাওয়া বংশানু সংকেতবাহী অবস্থায়, কিন্তু নতুন করে সেই বিদ্যার বহরে সংযোজন করতে পারেনি কিছুই। আমার বিশ্বাস, এই যে জ্ঞান ম্যারাকট এখান থেকে আহরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, একে কাজে লাগিয়ে তিনি অচিরেই জগৎজনের শীর্ষে পৌঁছে যাবেন। স্ক্যানলানের কিন্তু মাথা চলে বিদ্যুৎ গতিতে, যান্ত্রিক দক্ষতাও অবিশ্বাস্য— তাই কারিগরদের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে যা পারছে, তা-ই শিখে নিচ্ছে। অতলে তলিয়ে যাওয়ার আগে ইস্পাতের ঢোকবার সময়ে পকেটে করে এনেছিল একটা মাউথ অরগ্যান। পাতাল কারিগরদের জমিয়ে রেখে দিয়েছে সেই বাজনা দিয়ে। মোজার্ট সঙ্গীত শুনতে পেলে আমি আর ম্যারাকট খুশি হতাম। স্ক্যানলান কিন্তু মাতিয়ে রেখেছে সবাইকে ওর মার্কিনী গিটকিরি বাজিয়ে।

পুরো অট্টালিকাটা যে আমাদের দেখাশুনোর আওতার মধ্যে ছিল না, সে কথা আমি আগেই বলেছি। এ বিষয়ে আরও কিছু বিশদে আমি যেতে পারি। টানা লম্বা অলিন্দ পথ দেখেছিলাম সব সময়েই লোকজনের যাতায়াতে সরগরম। কিন্তু কিছুতেই আমাদেরকে সেদিকে নিয়ে যেত না আমাদের গাইডরা। খুবই স্বাভাবিক, এর ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল আমাদের কৌতূহল। এক সন্ধ্যায় ঠিক করলাম, নিজেরাই অভিযান চালাব সেদিকে। সরে পড়েছিলাম ঘর থেকে, চলে গেছিলাম অজানা সেই অঞ্চলে— যে সময়ে সেদিকে লোকজনের ভিড় থাকে কম। থাকে না বললেই চলে।

গলিপথ বেয়ে গিয়ে পৌঁছেছিলাম একটা খুব উঁচু খিলেনওলা দরজার সামনে— মনে হয়েছিল সেই দরজা আগাগোড়া সোনা দিয়ে তৈরি। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখেছিলাম রয়েছি একটা বিশাল ঘরের মধ্যে। চৌকোনা হল ঘর। এক-একদিকের মাপ দু-শো ফুট। চারদিকের দেওয়ালে জ্বলজ্বলে রং দিয়ে আঁকা অনেক অসাধারণ ছবি, ছবি ছাড়াও রয়েছে বিস্তর কিম্ভূত দর্শন প্রাণীদের মূর্তি। তাদের মাথার মুকুটগুলোর সাইজ প্রকাণ্ড— আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের রাজমুকুটের মতো। সুবিশাল সেই হলঘরের এক প্রান্তে বসা অবস্থায় রয়েছে বিরাট এক মূর্তি, বুদ্ধমূর্তির মতো পা মুড়ে, কিন্তু বুদ্ধমূর্তিতে যে প্রশান্তি থাকে, তার তিলমাত্র নেই। রয়েছে ঠিক তার উলটো মুখভাব— প্রচন্ড ক্রোধ যেন ফেটে ফেটে পড়ছে মুখাবয়বে। মুখবিবর ঈষৎ হাঁ করা। চোখের মধ্যে যেন অগ্নিকণা। লাল চোখ।

আরও গনগনে দেখাচ্ছে ভেতরের দিকে দুটো বিদ্যুৎবাতি থাকার জন্যে। কোলের ওপর রয়েছে একটা উনুন, ছাইভরতি।

ম্যারাকট বললেন, 'মোলোক! অথবা, বাল। ফিনিসিয়ানদের প্রাচীন দেবতা।'

প্রাচীন কার্থেজ-এর ছবি আমার মনের চোখে ভেসে উঠেছিল। বলেছিলাম ভীষণ বিস্ময়ে, 'যাচ্চলে! এরা কি তাহলে নরবলি দেয়!'

উদ্বিগ্ন স্বরে বলেছিল স্ক্যানলান, 'আমাকে বলি দিতে এলে মজাটা টের পাইয়ে দেব।'

আমি বলেছিলাম, 'সে চেষ্টা আর করে না বলেই মনে হয়। যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। দয়া আর করুণার মাহাত্ম্য বুঝেছে সেই শিক্ষার পর থেকেই।'

ম্যারাকট বললেন, 'ঠিক।' বলেই, ছাই ঘাঁটতে লাগলেন, 'এ দেবতা বংশ পরম্পরার দেবতা। তবে এদের ধর্মবোধ এখন অনেক শান্ত। এ সবই রুটি পোড়ানো ছাই। একটা সময়ে কিন্তু— ' চিন্তাভাবনায় বাধা পড়েছিল, পেছন দিক থেকে কঠিন কঠোর এক ধমকে। দেখেছিলাম, বেশ কয়েকজন এসে গেছে আমাদের পেছনে। মন্দিরের পুরুত। মাথায় উঁচু টুপি, গায়ে হলুদ বসন। তাদের রক্তচক্ষু আর ভয়াল মুখচ্ছবি দেখেই বুঝলাম, 'বাল' বিগ্রহের সামনে আর একটু হলেই বলি হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। একজন তো কোমরের খাপ থেকে ছোরা বের করে ফেলেছিল। রক্তজল করা চিৎকার ছেড়ে বাকি সবাই আমাদের খেদিয়ে দিল বেদীর সামনে থেকে।

তারস্বরে বলেছিল স্ক্যানলান, 'গায়ে হাত দিলেই খতম করে দেব। এই সরে যা... হাত ছেড়ে দে?'
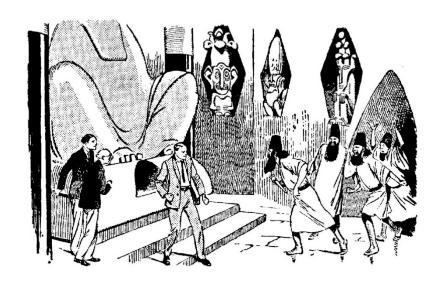
মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল, এই বুঝি তিনজনকেই আহুতি দেওয়া হবে রক্ত পিপাসু সেই বিগ্রহের সামনে। কোনও রকমে রেগে চন্ডাল মেকানিককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলাম আমাদের থাকবার জায়গায়। তবে ম্যান্ডা আর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের ভাবসাব দেখে বুঝলাম, আমাদের এই অভিযান তারা ভালো চোখে দেখেনি।

এই মন্দির ছাড়া ছিল আর একটা জায়গা। সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোনও রকম নিষেধের ঘেরাটোপ না থাকায়। অপ্রীতিকর অপ্রত্যাশিত কিছুই ঘটেনি সে জায়গায়। জায়গাটা আমাদের থাকবার জায়গা থেকে সঙ্গীদের জায়গায় যেতে গেলে যাতায়াতের পাশেই পড়ে। সেটা একটা ঘর, দেবালয়ের নিচের ঘর। ঘরের দেওয়ালে টেওয়ালে কোথাও কোনও কারুকাজ বা উৎকীর্ণ মূর্তি বা হরফ নেই। ঘরের প্রান্তে রয়েছে একটা হাতির দাঁতের মূর্তি— মহাকাল তাকে হলদেটে করে দিয়েছে। সে মূর্তি এক রমণীর, হাতে বর্শা, কাঁধে বসে একটা প্যাঁচা। ঘরের গার্জেন হিসেবে ছিল অতি বৃদ্ধ এক পুরুষ; বয়স তার যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়েছিল, এই যে যাদের মধ্যে এসে পড়েছি, এদের সমগোত্রীয় নয় এই অতি বৃদ্ধ— অন্য প্রজাতির মানুষ, মন্দিরে যারা আছে তাদের চেয়ে কৃষ্টি সংস্কৃতিতে উন্নততর, আকৃতিতে বড়। আইভরি স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যখন স্থির দৃষ্টিতে মূর্তি দেখে যাচ্ছি, তখন ম্যারাকট আর আমার দু-জনেরই মনে হয়েছিল, এরকম মূর্তি আগেও যেন কোথায় দেখেছি।

অতিবৃদ্ধ বিপুলকায় সেই ব্যক্তি তখন বলেছিল, 'থিয়া।' সচমকে বলেছিলাম আমি, 'আরে সর্বনাশ! এ যে দেখছি গ্রিক বলছে!'

'থিয়া? এথেনা?' ফের গ্রিক শব্দ ত্যাগ করেছিল অতিবৃদ্ধ।

নিঃসন্দেহে দেবী এথেনার কথা বলছে সেই বৃদ্ধ। ম্যারাকটের ওয়ান্ডারফুল ব্রেন বিবিধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ থাকায় তৎক্ষণাৎ জেরা শুরু করে দিয়েছিলেন ধ্রুপদী গ্রিক ভাষায়— যার কিছুটা বোঝা গেছিল, কিছুটার উত্তর এসেছিল এমনই প্রাচীনতর সংলাপের মধ্যে দিয়ে যার মাথামুণ্ড কিস্‌সু বোঝা যায়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও বেশ কিছু জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছিলেন ম্যারাকট এবং আবছাভাবে আমাদের বোধগম্য হওয়ার মতো কিছু জ্ঞানও পরিবেশন করতে পেরেছিলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ক্লাসে লেকচার দেওয়ার ভঙ্গিমায় উঁচু গলায় আমাদের বলেছিলেন, ‘অত্যাশ্চর্য একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। এতদিন যা স্রেফ কিংবদন্তী বলেই মনে হয়েছিল, তার যে একটা ভিত আছে, সত্যতা আছে, তা জানা গেল। সব কিংবদন্তীর মূলে একটা না একটা ঘটনা থাকে, কালপ্রবাহে তা বিকৃত অস্পষ্ট হয়ে আসে। হয় তো জানা আছে, অথবা আদৌ জানা নেই— (‘জানছেন কী করে?’ স্ক্যানলানের ফুটুনি)— আটলান্টিস দ্বীপ যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন একটা যুদ্ধ চলছিল আদিম গ্রিক আর আটলান্টিয়ানদের মধ্যে। সোলন এর বিবৃতির মধ্যে আছে সেই ঘটনার বর্ণনা— উনি জেনেছিলেন সাইস-এর পুরুতদের মুখে। ধরে নিতে পারি, সেই সময়ে আটলান্টিয়ানদের হাতে তখন বন্দি অবস্থায় ছিল কিছু গ্রিক কয়েদি, তাদের কেউ কেউ সেবা দিয়ে যেত মন্দিরে, এরাই সেখানে বহন করে নিয়ে এসেছিল স্ব-ধর্ম। এই যে বুড়োটার সঙ্গে আলাপ জমে গেল, আমার বিশ্বাস প্রাচীন সেই ধর্মের উপাসকদের বংশধর সে— এদের আরও অনেকের সঙ্গে পরে আমাদের আলাপ জমে যেতেও পারে।’

স্ক্যানলান বললে, ‘সেটা ভালো মনে করলেই ভালো। প্লাস্টার ভগবানকেই যদি পুজো করতে হয়, তাহলে সে লালচোখো আর কোলের ওপর কয়লার ছাই নিয়ে বসে থাকা দেবতা না হয়ে ফাইন একটা মেয়ে মানুষ হলেই ভালো।’

আমার মন্তব্য, ‘আপনার কপাল ভালো এসব কথা ওদের কানে পৌঁছোচ্ছে না। পৌঁছে গেলেই খ্রিস্টান শহীদ হয়ে যেতে হবে।’

‘দূর মশায়, এমন জাজ বাজাব, শুনে ঠান্ডা মেরে যাবে। মনে তো হয় আমাকে পছন্দ করে ফেলেছে— আমি ছাড়া ওদের চলবেই না।’

তা বটে। ফুর্তিবাজ মানুষগুলোকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলাম ভালোভাবেই। মাঝে মধ্যে অবশ্য মন কেমন করত দেশের জন্যে। মনের চোখে দেখতে পেতাম চারদিকে প্রাঙ্গণ দিয়ে ঘেরা চতুর্ভুজ অক্সফোর্ড, অথবা হার্ভাড-এর অতিপ্রিয় চত্বর আর সুপ্রাচীন এলম বৃক্ষরাশি। সেই সময়টায় মনের এই দৃশ্যগুলোকে মনে হত বুঝি চাঁদের প্রকৃতি-সুন্দর প্রান্তর, আর ঠিক তখনই আবার সেই সব জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্যে ছটফটিয়ে উঠত মনটা।

এর দিন কয়েক পরেই আমাদের গৃহস্বামী অথবা কয়েদকারীরা— কী নামে তাদের ডাকব, এই সংশয় মাঝে মধ্যেই দেখা দিত মনের মধ্যে— আমাদের নিয়ে গেল সাগরতলের এক অভিযানে। ছ-জন এসেছিল আমাদের সঙ্গে— ম্যান্ডা ছিল তাদের মধ্যে। যে প্রস্থান-কক্ষে আমরা প্রথমে জড়ো হয়েছিলাম সমুদ্রের তলা থেকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফেরবার পর, জড়ো হলাম সেই ঘরেই। ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখবার ফুরসত পেয়েছিলাম তখনই। জায়গাটা বিশাল, এক-এক দিকে একশো ফুট তো বটেই, দেওয়ালগুলো সবুজ হয়ে গেছে শ্যাওলা আর সামুদ্রিক উদ্ভিদের প্রতাপে। শুধু সবুজ নয়, স্যাঁতসেঁতেও বটে। সারবন্দি খোঁটা পোঁতা ঘরের চার দেওয়ালে। প্রতিটি খোঁটা থেকে ঝুলছে কাচের মতন অর্ধস্বচ্ছ পোশাক, আর একজোড়া কাঁধ ব্যাটারি যার দৌলতে শাসপ্রশ্বাস চালানো যায় স্বচ্ছন্দে। চাকা চাকা পাথর দিয়ে বাঁধানো মেঝের বহু জায়গায় গোল গোল গর্ত হয়ে গেছে বহু বছর ধরে হাঁটা চলার ফলে, জল জমে রয়েছে সেই সব গর্তে। কার্নিশের ধারে ধারে বসানো ফ্লোরেসেন্ট টিউব আলোর দৌলতে আলোয় আলো হয়ে রয়েছে অতবড় ঘরটা। অধস্বচ্ছ কাচ-পোশাকে আমাদের মুড়ে দেওয়ার পর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল একটা করে হালকা ধাতু দিয়ে তৈরি ছুঁচোলো মুখ দণ্ড। তারপর ম্যান্ডা-র আদেশ অনুযায়ী চেপে ধরলাম দেওয়াল বরাবর বসানো রেলিং— নিজেরাই আগে রেলিং খামচে ধরে দেখিয়ে দিল কী করতে হবে আমাদের। কারণটা বোঝা গেল অচিরে। কেননা, একটু পরেই বাইরের দরজাটা একটু একটু করে খুলতেই এত তোড়ে জল ঢুকতে লাগল ভেতরের রেলিং খামচে ধরে না থাকলে জলের তোড়ে ঠিকরে যেতাম। জল উঠতে লাগল দ্রুত, ছাড়িয়ে গেল আমাদের মাথা, সেই সঙ্গে কমে এল জল চাপ। দরজার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ম্যান্ডা, সদলবলে ফের বেরিয়ে গেলাম সমুদ্রতলে, দরজা খোলা রইল আমাদের ফিরে আসার জন্যে।

কেঁপে কেঁপে যাওয়া শীতল প্রেতালোকের মধ্যে তাকিয়েছিলাম আশপাশে! গভীর সমুদ্রতল আলোকিত হয়েছিল অস্পষ্ট বিবর্ণ প্রেতালোকে। দেখতে পাচ্ছিলাম সব দিকের সিকি মাইল পর্যন্ত। অবাক হয়েছিলাম একটা অত্যুজ্জ্বল দ্যুতি দেখে যা দেখা যাচ্ছিল আমাদের দৃষ্টিসীমার ঠিক বাইরে। দলনায়ক পা চালিয়ে চলেছেন সেই দিকেই, লাইনবন্দি

অবস্থায় দলের বাকি সবাই ছিল তার পেছনে। যেতে হচ্ছিল খুবই আস্তে আস্তে, কেননা জলের বাধা তো ছিলই, তার ওপরে প্রতি পদক্ষেপে পা বসে যাচ্ছিল নরম কাদাপাঁকের মধ্যে। একটু পরেই সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম উঁচু জায়গার সেই আলোক সংকেতের স্বরূপ। আমাদের সেই ইস্পাত-কক্ষ, পার্থিব জীবনের শেষ ক-টা ঘণ্টা কাটিয়েছি যে স্টিল বক্সের মধ্যে, সেটি কাত হয়ে পড়ে আছে বহুদূর বিস্তৃত এক প্রাসাদের একটা গম্বুজের ওপর— জ্বলছে সবক-টা আলো। তিন-চতুর্থাংশ জলে ভরে গেছে, কিন্তু বন্দি বাতাস তখনও টিকিয়ে রেখেছে সেই অংশটা যেখানে রয়েছে আমাদের ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি। চমৎকৃত হয়েছিলাম সেই দৃশ্য দেখে। অতি পরিচিত অভ্যন্তরের সোফা আর কলকবজা যেখানে যেখানে ছিল, সেখানে সেখানেই আছে, বেশ কয়েকটা বড় সাইজের মাছ খেলে বেড়াচ্ছে সেখানে যেমন করে অ্যাকোয়ারিয়ামে রঙিন মাছের দঙ্গল ঘুরপাক খায়। একে একে আমরা খোলা অবস্থায় থাকা মেঝের লৌহকপাট দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম ভেতরে। জলে ভাসছিল অনেক কিছু লেখা ম্যারাকটের একটা নোটবই— তিনি তৎপর হয়েছিলেন সেটি তুলে নিতে। স্ক্যানলান আর আমি নিয়েছিলাম ব্যক্তিগত খানকয়েক জিনিস। জনা দুই সঙ্গী নিয়ে ম্যান্ডাও ঢুকেছিল ভেতরে! ভীষণ আগ্রহে দেখে যাচ্ছিল ব্যাথোমিটার, থার্মোমিটার, আরও অনেক যন্ত্রপাতি যা লাগানো ছিল দেওয়ালে। থার্মোমিটারটা আমরা দেওয়াল থেকে খুলে নিয়ে কাছে রেখেছিলাম। মর্তের বৈজ্ঞানিকরা বিস্মিত হতেন থার্মোমিটারের তাপাঙ্ক দেখে। সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চলে— পৃথিবীর মানুষ এই প্রথম যেখানে নেমেছে সেখানকার তাপাঙ্ক চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট, কি তারও একটু বেশি কাদা পাঁকের রাসায়নিক পচনের জন্যে, যা সমুদ্রের ওপরের দিকের তাপমাত্রার চেয়ে ঢের বেশি।

ছোট্ট এই অভিযানের উদ্দেশ্য শুধু আমাদের ইস্পাত কক্ষের শেষ পরিণতি দেখানোর জন্যেই নয়। আমরা খাদ্য শিকার করে যাচ্ছিলাম। মাঝে মধ্যেই দেখছিলাম সঙ্গীরা ছুঁচোলো সড়কি দিয়ে চ্যাপটা বাদামী মাছ গাঁথছে, পায়রাচাঁদা মাছ টারবটের মতন দেখতে, দলে দলে এই মাছ টহল দিয়ে যাচ্ছিল গোটা অঞ্চলটা জুড়ে, কিন্তু কাদামাটির খুব কাছাকাছি থাকার ফলে অভ্যস্ত চোখ ছাড়া তাদের ঠাহর করা যাচ্ছিল না। একটু পরেই দেখা গেল, সঙ্গীদের প্রত্যেকের কোমরবন্ধনীতে এই রকমের দু-তিনটে মাছ। স্ক্যানলান আর আমিও শিখে গেলাম মৎস্য শিকারের কায়দা এবং দু-জনের প্রত্যেকেই ধরলাম দুটো করে মাছ।

ম্যারাকট কিন্তু হেঁটে গেলেন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায়, মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত মন্তব্যও করে গেলেন যা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হল না মোটেই। দেখতে পেলাম শুধু চক্ষু ইন্দ্রিয় দিয়ে ওষ্ঠযুগলের চকিত নৃত্য।
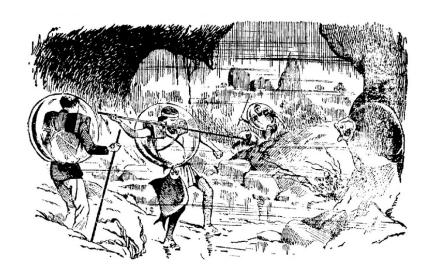
প্রথম প্রথম সব কিছু একঘেয়ে লাগলেও একটু পরেই বৈচিত্র্যের বাহারে মন জুড়িয়ে গেল। সমুদ্রতলের এই ধু-ধু প্রান্তরে একঘেয়েমি নেই মোটেই, আছে বিবিধ বৈচিত্র্য। নিতল স্রোত ফল্গুনদীর মতোই ধারাস্রোত দিয়ে প্রান্তরকে ভেঙেচুরে ঢেউ খেলিয়ে রকমারি রূপ দিয়ে গেছে। নরম কাদা পাঁক ফেটে ফেটে তলার মাটি বের করে দিয়েছে। সেখানকার মেঝেতে রয়েছে লালচে কাদা, যা দিয়ে গড়ে উঠেছে সাগরতলের সব আকৃতি, লাল কাদায় বেরিয়ে আছে খোঁচা খোঁচা সাদাটে বস্তু— প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল ঝিনুক, কাছে গিয়ে চোখ চালিয়ে দেখলাম— জিনিসগুলো তিমির কানের হাড়, হাঙরের এবং অন্যান্য সাগর দানবদের ধারালো দাঁত। একটা দাঁত তুলে নিয়ে মেপে দেখেছিলাম পনেরো ইঞ্চি লম্বা, শিহরিত হয়েছিলাম সমুদ্রপৃষ্ঠে এইরকম দাঁতের কেরামতি কল্পনা করে নিয়ে। ম্যারাকট পরে বলেছিলেন, এ দাঁত ডলফিন জাতীয় বৃহৎ সামুদ্রিক জীব গ্র্যামপাস অথবা ওরকা মল্লবীরের। উদাহরণস্বরূপ বলেছিলেন, মিচেল হেজেস-এর পর্যবেক্ষণ বৃত্তান্ত। তিনি দেখেছিলেন, সমুদ্রের অতিশয় ভয়াবহ হাঙরের গায়ে এমন সব দন্তক্ষত দেখা গেছে যা থেকে বোঝা যায় তাদেরকে লড়ে যেতে হয়েছে তাদের চেয়েও বড় আর ভয়ংকর প্রাণীদের সঙ্গে।

সমুদ্রতলের একটা বৈশিষ্ট্য দাগ রেখে যায় পর্যবেক্ষকের মনের পরতে। আগেই বলেছি, বিস্তর জৈব পদার্থের পচনের দরুন সমুদ্রতল শতল প্রভায় সদা স্বতঃদীপ্ত। তার ওপরেই কিন্তু সব কিছুই ঘোর অমানিশার কৃষ্ণকালো। শীতার্ত দিনে পৃথিবীর ওপরে বিদ্যুৎগর্ভ কৃষ্ণকালো মেঘ চেপে থাকার মতো ব্যাপার। তমাল প্রতিম এই চাঁদোয়া থেকে অনবরত ঠিকরে যাচ্ছে খুদে খুদে সাদাটে কণিকা, নিষ্প্রভ পটভূমিকায় যা বেশ বিষন্ন। এরা সবই সমুদ্র শামুকের রাশি রাশি খোলা, অন্য অন্য খুদে প্রাণীদের খোলস। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ মাইল নিচের সমুদ্রতলের মধ্যেকার অঞ্চলে এদের নিবাস এবং মৃত্যু হয় বলেই তাদের খোলস নিচে এসে পড়ে কবরস্থ করেছে বিশাল দূরবিস্তৃত শহরকে— যে শহরের ওপরদিকের উঁচু অঞ্চলে ঠাঁই পেয়েছি আমরা তিনজনে।

পায়ের তলার পৃথিবীর সঙ্গে শেষ সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আমরা জলতল জগতের মধ্যে দিয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে পড়েছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে। নড়াচড়ার চিহ্ন দেখেছিলাম। চোখের সামনে। অর্ধস্বচ্ছ কাচ আবরণে শরীর ঢেকে চলেছে দলে দলে মানুষ, টেনে নিয়ে চলেছে স্লেজগাড়ি ভরতি কয়লা। খুবই মেহনতের কাজ। স্লেজ যারা টানছে হাঙরের চামড়া দিয়ে তৈরি দড়ি ধরে, তারা ঝুঁকে বেঁকে পড়ছে অত বোঝা টেনে নিয়ে যেতে গিয়ে। প্রত্যেকটা দলে রয়েছে কর্তৃত্বব্যঞ্জক একজন করে পুরুষ— হুকুমদার— সুস্পষ্ট দেখলাম দলপতি এক জাতের মানুষ, গোলামরা অন্য জাতের মানুষ। গোলামরা দীর্ঘাকায়, ফর্সা, নীলচক্ষু, শক্তিময় বপুর অধিকারী। অন্যান্যরা, আগেই বলেছি, কৃষ্ণকায়— প্রায় নিগ্রো ধরনের চৌকোনা চওড়া বপুর অধিকারী। সেই মুহূর্তে এই রহস্যের জবাব আমরা পাইনি— তলিয়ে ভাববার অবসরও ছিল না, কিন্তু সুস্পষ্ট মনে হয়েছিল বংশ পরম্পরায় একটা জাতি আর একটা জাতির ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে গোলাম বংশ টিকিয়ে রেখেছে। ম্যারাকট বলেছিলেন, গোলাম যারা, তারা গ্রিক বন্দিদের বংশধর— যাদের দেবীকে আমরা দেখে এসেছি দেবালয়ের নিচের ঘরে।

কয়লার খনিতে এসে পৌঁছোনোর আগে দেখলাম এই রকম গোলামদের বেশ কয়েকটা দল। প্রত্যেকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্লেজ গাড়ি ভরতি কয়লার চাঙড়। তারপরে এসে পৌঁছোলাম কয়লার খনিটায়। এই জায়গাটার গভীর সমুদ্রের তলানি আর বালির স্তূপ চেঁছে সাফ করে ফেলা হয়েছে। মস্ত একটা কয়লার খনি মুখ ব্যাদান করে রয়েছে। সেখানে রয়েছে কয়লার স্তরের পরেই কাদার স্তর, তারপরেই কয়লার স্তর; পর্যায়ক্রমে কয়লা

আর কাদার স্তর। বহু আগের যে জগৎ এখন ধ্বংস হয়ে গেছে, আটলান্টিকের জলতলে বিরাজ করছে সেই অবস্থা আর ব্যবস্থা। সুবিস্তীর্ণ এই খননভূমির বেশ কয়েক জায়গায় দেখলাম গোলামের দল চাঁই চাঁই কয়লা কেটে স্তূপাকারে সাজাচ্ছে, অন্যান্যরা সেই স্তূপ থেকে কয়লা তুলে চুপড়িতে সাজাচ্ছে, সেই চুপড়ি অথবা ছোট ছোট বাক্স কয়লাশুদ্ধ টেনে ওপরে তোলা হচ্ছে। পুরো কয়লার খনিটা এতই বিরাট যে আমরা অপর প্রান্তটা দেখতেই পেলাম না— পুরুষানুক্রমে গোলামরা কয়লা কেটে কেটে খনি অঞ্চল বাড়িয়েই চলেছে। এই কয়লা পরে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তিতে— যে শক্তি চালিকাশক্তি হয়ে জলতলের সুবিস্তীর্ণ আটলান্টিয়ান কলকবজা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখের দরকার বলেই জানাচ্ছি, এই ব্যাপারটা যখন ম্যান্ডা-কে বলা হয়েছিল, তখন সে বিপুল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিল। অন্যান্যদের অবস্থাও দাঁড়িয়েছিল সেইরকম। আমরা যে এত খবর জানি, তা ওদের পিলে চমকে দিয়েছিল। তারপর সবেগে মস্তিষ্ক চালনা করে বলেছিল, সব সত্যি, সব সত্যি। আমরা যা বলছি, তা খাঁটি কথাই বটে, আজগুবি কপোল কল্পনা নয়।

সুবিশাল কয়লার খনি পাশ কাটিয়ে ডানদিকে গিয়ে আমরা এসে গেলাম সারবন্দি আগ্নেয় টিলার মধ্যে। পৃথিবীর জঠর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার সময়ে তাদের গা যেমন চকচকে পরিচ্ছন্ন ছিল, এখনও রয়েছে সেইরকম, শীর্ষদেশ কিন্তু কয়েকশো ফুট উঁচুতে উঠে গিয়ে হারিয়ে গেছে চোখের নাগালের বাইরে। এইসব আগ্নেয় টিলাদের পাদদেশ সমাকীর্ণ এবং আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে গভীর সমুদ্রের নিরেট জঙ্গলে— যাদের অভ্যুত্থান ঘটেছে পার্থিব আমলের প্রবাহের কঙ্কাল থেকে। ঘন বসতির কিনারা বরাবর অনেকক্ষণ ধরে আমরা হেঁটে গেছিলাম, সঙ্গীরা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মজা করবার জন্যে বের করে আনছিল অসাধারণ রকমের বিবিধ প্রজাতির মীন মহাশয়দেরকে, মাঝে মাঝে ছুঁচোলো শিক দিয়ে গেঁথে গেঁথে তুলে আনছিল খানকয়েক, পাত সাজিয়ে উদরপূর্তির জন্যে। এই রকম মজা করতে করতে আমরা প্রায় এক মাইল কি তারও বেশি হেঁটে যাওয়ার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছিল ম্যান্ডা, বেশ খানিকটা ভীতি আর বিস্ময়বোধ নিয়ে তাকিয়েছিল চারধারে। জলতলের অঙ্গভঙ্গীই তো একটা ভাষা ওদের মধ্যে। অর্থটা নিমেষের মধ্যে বুঝে নিয়েছিল সাঙ্গপাঙ্গরা। চমকিত চিত্তে বুঝলাম আমরাও তারপরেই! অদৃশ্য হয়ে গেছেন ডক্টর ম্যারাকট।

কয়লার খনিতে তো ছিলেন আমাদের সঙ্গেই। আগ্নেয় টিলা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। এগিয়ে নিশ্চয় যাননি, গেলে দেখা যেত। তাহলে নিশ্চয় পেছিয়ে পড়েছেন—ফেলে আসা জঙ্গলের মধ্যে কোথাও থেকে গেছেন। বিচলিত হয়েছিল আমাদের বন্ধুবর্গ। আমরা কিন্তু হইনি। আমরা যে জানি তাঁর অন্যমনস্ক স্বভাব! একটু খুঁজলেই নিশ্চয় দেখব, সমুদ্রতলের কোনও এক প্রাণীর আকর্ষণে আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন কোথাও। দল বেঁধে ফিরে গেছিলাম মাড়িয়ে আসা পথ বেয়ে, একশো গজ যেতে না যেতেই দেখতে পেয়েছিলাম তাঁকে।

কিন্তু উনি যে ভাবে দৌড়চ্ছেন, ওই বয়েসে অমন দৌড় তো অসম্ভব তাঁর পক্ষে। তবে কি, দৌড়বাজ মোটেই নয়, এমন মানুষও ভয় পেলে দৌড়োয় পাঁইপাঁই করে। উনি দৌড়াচ্ছেন দু-হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, মুহুর্মুহু হোঁচট খেয়ে পড়ছেন হুমড়ি খাচ্ছেন তড়িঘড়ি এলোমেলোভাবে চম্পট দিতে গিয়ে। এমন উন্মত্তের মতো দৌড়োনোর কারণও আছে। ভয়ালদর্শন তিনটে প্রাণী তাঁকে তাড়া করেছে। বাঘা কাঁকড়া, আগাগোড়া সাদা-কালো ডোরাকাটা, প্রত্যেকটার সাইজ নিউফাউন্ডল্যান্ড কুকুরের মতন। ডক্টরের কপাল ভালো এই কারণে যে তিন যমদূতের স্পিড তেমন বেশি নয়, খুবই মন্থরগতি, কাদাটে পাঁকানো জমির ওপর ডাইনে বাঁয়ে হেলে দুলে তারা যে স্পিডে আসছে, তা ডক্টরের স্পিডের চেয়ে সামান্য বেশি।
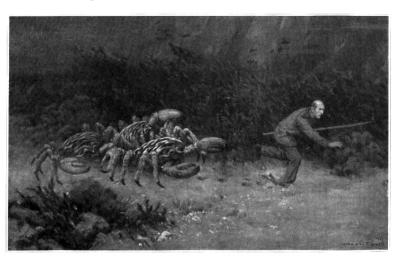
সব মিলিয়ে তাদের গতিবেগ ঈষৎ দ্রুততর হওয়ার মিনিট কয়েকের মধ্যেই কাঁকড়া মহাশয়দের কড়া দাঁড়া খামচে ধরে ফেলত ম্যারাকট মশায়কে, যদি না আমরা ঠিক সময়ে

গিয়ে পৌঁছোতাম। আমাদের সঙ্গে যারা গেছিল, তারা তৎপর হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। ছুঁচোলো লাঠি নিয়ে তেড়ে গেছিল সামনের দিকে, ম্যান্ডা ফ্লাস মেরেছিল শক্তিশালী একটা ইলেকট্রিক লণ্ঠন থেকে যা ঝোলানো ছিল কোমরের বেল্টে। ফোকাস মেরেছিল গা ঘিনঘিনে দানোগুলোর মুখের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে তারা ছিটকে গিয়ে চম্পট দিয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে, চলে গেছিল চোখের আড়ালে। কমরেড ম্যারাকট ঝুপ করে বসে পড়েছিলেন একটা কয়লার চাঁইয়ের ওপর। মুখ দেখে বোঝা গেছিল, দম ফুরিয়েছে একদম। নিতান্তই পরিশ্রান্ত— অ্যাডভেঞ্চারের দাম দিতে হয়েছে বিলক্ষণ। পরে আমাদের বলেছিলেন জঙ্গলে ঢোকার কারণটা। ইচ্ছে ছিল ধরে নিয়ে যাবেন গভীর জলের একটা কিমেয়্যার‍্যা— যা কিনা কল্পিত অগ্নিবর্ষী দৈত্যবিশেষ, যার মুণ্ড সিংহের মতন, লেজ সাপের মতন, আর শরীরটা ছাগলের মতন। ভুল করে ঢুকে পড়েছিলেন ভীষণ হিংস্র টাইগার-কাঁকড়ার বাসার মধ্যে। তাড়া খেয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর যাত্রা শুরু করার দম ফিরে পেয়েছিলেন।

আগ্নেয় পাথরের ঝুঁকে পড়া একটা পাহাড়ের খাড়া দিক ঘুরে পেরিয়ে আসবার পর পৌঁছেছিলাম গন্তব্যস্থানে। সামনের ধূসর প্রান্তরে দেখেছিলাম এলোমেলো ছোট-ছোট ঢিবি আর খুব উঁচু ঠেলে বেরিয়ে আসা উদগত পাঁকের ঢিবি, যা থেকে বুঝে নিয়েছিলাম পায়ের তলায় রয়েছে এককালের সেই বিরাট শহর। হারকিউলেনিয়াম যেভাবে এক্কেবারে ডুবে গেছে লাভার মধ্যে, অথবা পম্‌পেই শহর ছাইয়ের মধ্যে— সেই ভাবেই চিরকালের মতো পাঁকের মধ্যে ডুবে থাকত পেল্লায় এই শহর, যদি না মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে যারা টিকে গেছিল, তারা খোঁড়াখুঁড়ি করে বেরিয়ে আসবার পথ নিজেরা বানিয়ে নিত। এখানকার প্রবেশপথ লম্বাটেভাবে নিচের দিকে কেটে বের করা হয়েছে, সেই পথ নেমে গিয়ে মিশেছে একটা প্রশস্ত রাজপথে— দু-পাশে ঠেলে বেরিয়ে আছে সারবন্দি বাড়ি। মাঝে মধ্যেই ফেটে গেছে অথবা ভেঙে পড়েছে এই সব বাড়িগুলোর দেওয়াল, মন্দিরের দেওয়ালের মতো নিরেট গঠন মজবুত নয় বলে, কিন্তু ভেতরকার যা কিছু সে সব প্রায় যেমন তেমনি থেকে গেছে মহাপ্রলয়ের সময়ে, পরিবর্তন ঘটিয়ে গেছে শুধু সাগরের জল, কোথাও সুন্দর আর দুর্লভভাবে, কোথাও ভয়ংকরভাবে পালটে পালটে দিয়েছে ঘরগুলোর চেহারা। প্রথমদিকের সৌধগুলোয় পথ প্রদর্শকরা আমাদের ঢুকতে না দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছিল সামনের দিকে— অবশেষে পৌঁছেছিলাম প্রকাণ্ড সেই প্রাসাদের সামনে যেটাকে

ঘিরে গড়ে উঠেছে গোটা শহরটা। দেখবার মতো সেই প্রকাণ্ড ইমারতের মোটা মোটা অনেক উঁচু স্তম্ভশ্রেণী, খোদাই করা কার্নিশ আর তার নিচের কারুকাজ, সুবিশাল সোপার্ণ শ্রেণী— এমন সৌধ পৃথিবীর কোথাও কখনও দেখিনি।
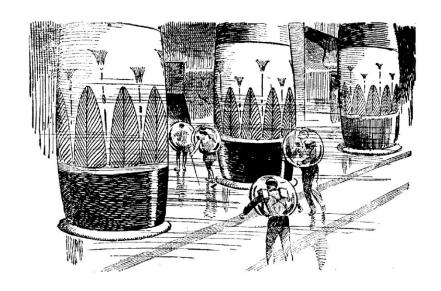
এই সবের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্য আছে বলা যেতে পারে মিশর দেশের লাক্সার-এর গার্নাক মন্দিরের। আরও অদ্ভুত এই কারণে যে যাবতীয় কারুকাজ আর অর্ধেক মুছে যাওয়া খোদাইকর্মের সঙ্গে নীলনদের পারের বিরাট ধ্বংসস্তূপের খোদাই কর্ম আর কারুকাজ করা শীর্ষদেশ তো একই রকমের। ছোট ছোট পাথর দিয়ে বাঁধানো রয়েছে বিশাল বিশাল হল ঘরের মেঝে, চারদিকে দাঁড়িয়ে মস্ত উঁচু পাথরের মূর্তি। আমরা স্তম্ভিত দৃষ্টি মেলে এইসব যখন দেখছি, তখন মাথার ওপর দিয়ে, আশপাশ দিয়ে কিলবিল করে ছুটে যাচ্ছিল সুবিশাল রুপোলি বান মাছ, আমাদের দিক থেকে ধেয়ে যাওয়া আলোর সামনে থেকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে টহল দিয়ে গেছি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে, দেখেছি বহু বিলাস-দ্রব্য আর লাম্পট্যের দোষ, বহুকালের কিংবদন্তী অনুসারে যে সবের জন্যে ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে এসেছিল এই দেশের ওপর। ছোট্ট একটা ঘরকে ভারি সুন্দরভাবে বাহারি করে তোলা হয়েছে ঝিনুকের মধ্যেকার শক্ত চকচকে রামধনু রঙের পদার্থের মিনা কারুকাজ দিয়ে। এমনই সুন্দরভাবে যে এত বছর জলের মধ্যে থেকেও জ্যোতির্বিকাশী বর্ণ বিচ্ছুরণ করে চলেছে আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এক কোণে রয়েছে একটা কারুকাজ করা পালঙ্ক হলদে ধাতু দিয়ে তৈরি, একই ধাতু দিয়ে তৈরি কারুকার্যময় একটা আরামকেদারা

রয়েছে এক কোণে, নিশ্চয় কোনও এক রানির শয়নকক্ষ, কিন্তু এখন আরামকেদারার পাশে অবস্থান করছে গা ঘিনঘিন করার মতো বপু নিয়ে একটা স্কুইড, নোংরা দেহ মৃদু ছন্দে উঠছে আর নামছে, অভিশপ্ত প্রাসাদের কেন্দ্রস্থলে এখনও যেন স্পন্দিত হয়ে চলেছে জঘন্য এক হৃৎপিন্ড। এমন একটা ভয়ানক জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে আমি যেমন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম, একই রকম স্বস্তির ভাব দেখেছিলাম সঙ্গীদের চোখে মুখে। তারপর দেখেছিলাম চকিতের জন্যে বৃত্তাকার অট্টালিকার মতো সিঁড়িওলা আসন সমেত একটা রঙ্গস্থল— এক কথায় আমরা যাকে বলি অ্যাম্ফিথিয়েটার— এখন যা ধ্বংসপ্রাপ্ত; দেখেছিলাম সাগরের তরঙ্গবেগ আটকানোর জন্যে পাথরের খিলেনওলা বাঁধ, পাশেই একটা লাইটহাউস— যা দেখে বুঝেছিলাম, এই শহর এক সময়ে ছিল সমুদ্রবন্দর; অশুভ লক্ষণ সমন্বিত অভিশপ্ত এই সব জায়গা ছেড়ে অচিরেই বেরিয়ে এসেছিলাম আমরা, ফের এসে গেছিলাম সমুদ্রতলের প্রান্তরে।

অ্যাডভেঞ্চারের ইতি ঘটেনি তখনও। পিলে চমকানো ভয়ানক একটা ব্যাপারের সামনাসামনি হতে হয়েছিল সবাইকেই। ঘরমুখো রওনা হওয়ার একটু পরেই জনৈক সঙ্গী সভয়ে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল ওপর দিকে। দেখেই তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিলাম তাদের মতো আমরাও। অপলকে সেদিকে তাকিয়ে থেকে দেখেছিলাম অসাধারণ এক দৃশ্য। অন্ধকারময় জলরাশির মধ্যে থেকে অতি বিশাল কৃষ্ণকায় একটা বস্তু বেরিয়ে এসে দ্রুত নেমে আসছে নিচের দিকে। প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল আকারবিহীন একটা কিছু, কিন্তু অতি দ্রুত আলোর আওতার মধ্যে চলে আসবার পর দেখলাম, বস্তুটা একটা দানবিক মাছের মৃতদেহ— ফেটে যাওয়ায় নাড়ি ভুঁড়ি ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে ওপর দিকে পতনের সঙ্গে সঙ্গে। গ্যাস জমে যাওয়ার দরুন নিশ্চয় ভাসিয়ে দিয়েছিল সাগরের ওপর এলাকায়, সেখানে তাকে ঠুকরে ঠুকরে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে হাঙরের দল, এখন নেমে আসছে গুরুভার মৃতদেহটা, সাগরের মেঝে লক্ষ করে। এতটা পথ হেঁটে আসবার সময়ে এরকম প্রাণীদের বিরাট কঙ্কাল দেখেছিলাম এর আগেই— ভেতর দিয়ে যাতায়াত করছে মাছের দল অজস্র ছেঁদা বানিয়ে নিয়ে, এই প্রাণীটা কিন্তু এখনও সেই রকমের অন্তিম অবস্থায় পৌঁছোয়নি সাগর দানবদের হানা শুরু না হওয়ায়। মৃতদেহটা যেখানে এসে পড়বে, সে জায়গা থেকে আমাদের টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেছিল সঙ্গীরা— একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গেছিল মাথার ওপরে পতনের আর কোনও সম্ভাবনা না থাকায়। অর্ধস্বচ্ছ হেলমেট মাথায়

থাকার দরুন জিনিসটা যখন আছড়ে পড়েছিল সমুদ্রতলে, তখনকার সেই আওয়াজ শুনতে পাইনি বটে, তবে মৃত সাগরিকাদের দেহাবশেষ সমন্বিত কাদাপাঁক যখন ছিটকে ছিটকে উঠে গেছিল ওপর দিকে বিশাল সেই কলেবর আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তখনই দেখে নিয়েছিলাম জিনিসটা কী। একটা স্পার্ম তিমির মৃতদেহ। লম্বায় পঁচাত্তর ফুট। জলতলের বাসিন্দাদের উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গী দেখে বুঝেছিলাম, বিশাল এই কলেবর থেকে তারা সংগ্রহ করতে পারবে বিস্তর পরিমাণ তিমির মাথার চর্বি, একশব্দে যাকে বলা হয় স্পার্ম্যাসিটি, আর তিমির শরীরের বিপুল পরিমাণ চর্বি। এ থেকে বানিয়ে নেবে অনেক বাতি, অনেক দাওয়াই, অনেক কিছু। মৃত তিমির ছিন্নভিন্ন মড়া সেইখানেই রেখে দিয়ে সেই সময়ে অবশ্য আমরা প্রত্যাবর্তন করেছিলাম আমাদের কারুকার্যময় খিলেনের তলার প্রবেশ কক্ষে, নিরাপদে দাঁড়িয়ে গেছিলাম জল বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত, খুলে ফেলেছিলাম অর্ধস্বচ্ছ পোশাক আর হেলমেট।

সময়ের হিসেব যেভাবে রেখেছিলাম, সেই হিসেবের বলে দিন কয়েক পরে, আগের দেখানো সেই সিনেমা দৃশ্যের মতো আর এক প্রস্থ সিনেমা দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল আমাদের অবগতির জন্যে। সাগরতলের এই মানুষদের অতীত যাতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের কাছে, এই উদ্দেশ্যে। সে বড় আশ্চর্য ইতিহাস। অত্যাশ্চর্য সেই মানুষদের ওয়ান্ডারফুল অতীত কাহিনি। এই আয়োজন করা হয়েছিল শুধু আমাদের জন্যে, আমাদের জ্ঞান তৃষ্ণা মিটোনোর উদ্দেশ্যে এমন কথা আমি বলছি না। অতীত যেন ভুলে না যায় বর্তমানের সাগরতলের বাসিন্দারা, এই উদ্দেশ্যেই মাঝে মধ্যে নাটকীয় এই আয়োজন করা হত, এই প্রদর্শনী ঘটানো হত— ভাগ্যক্রমে আমরা তখন হাজির ছিলাম এই রকম একটা সুদীর্ঘ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আসরে। ঠিক যেরকম দেখেছিলাম এবার তা বলা যাক।

বিশাল যে হল ঘরটায় স্ক্রিনের ওপরে ম্যারাকট আমাদের অ্যাডভেঞ্চার প্রদর্শন করেছিলেন, সেই হল ঘর অথবা থিয়েটার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাদের। সাগরতলের সমস্ত মানুষ জড়ো হয়েছিল সেখানে। আলোকময় পর্দার সামনে আমাদের নিয়ে গিয়ে দেওয়া হয়েছিল একই রকমের সম্মান। প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে গাওয়া হয়েছিল একটা গান। হয়তো তা দেশাত্মবোধক স্তোত্রপাঠ। তারপর এগিয়ে এসেছিল খুবই বয়োবৃদ্ধ শ্বেতকেশ এক পুরুষ। হয়তো তাদের ইতিহাস প্রণেতা। হাততালি পড়েছিল প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে। হাততালির মধ্যে দিয়েই সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফোকাস পয়েন্টে।

ঝকঝকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিল স্বজাতির উত্থান পতনের ইতিহাস পরম্পরা। সুস্পষ্ট সেই ছায়াছবির নাটকীয়তা মর্মস্পর্শী। সময় আর স্থান জ্ঞান বিস্মৃত হয়েছিল আমার দুই ছায়াসঙ্গী। ডুবে গেছিল দৃশ্য পরম্পরার আকর্ষণী শক্তির মধ্যে। বিষম বিচলিত হয়েছিল দর্শকবৃন্দ। বিয়োগান্তক নাটক যখন ধাপেধাপে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে, তখন তারা গুঙিয়ে উঠে কেঁদেও ফেলেছে। দৃশ্য পরম্পরার মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়ে গেছিল সুদূর অতীতের সেই ইতিহাস— পিতৃভূমির বিনাশ হওয়ার ইতিবৃত্ত, স্বজাতি ধ্বংসের মর্মন্তুদ কাহিনি।

ছায়াছবির প্রথম সিরিজে দেখেছিলাম সুপ্রাচীন সেই মহাদেশের গৌরব কাহিনি যার ঐতিহাসিক ধারাবিবরণী স্মৃতির মণিকোঠায় থেকে পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে পিতা থেকে পুত্রের মধ্যে। অত্যুন্নত এক সভ্যতার ছায়াছবি উন্মোচিত হয়ে গেল আমাদের অবাক চাহনির সামনে। উড়ন্ত পাখির চোখ দিয়ে দেখার মতো সেই দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে দেখলাম সুবিস্তীর্ণ সুমহান এক জনপদ, সেখানে জলসিঞ্চনের নদী-নালা-পরিখা অতিশয় সুপরিকল্পিত, কৃষিকার্যের মধ্যে বিদ্যমান বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা, দেখলাম জল সিঞ্চনের অভিনব পরিকল্পনা, বিশাল বিশাল শস্যভান্ডার, তরঙ্গায়িত উদ্যানের পর উদ্যান, লাভলি নদী, বনময় পর্বত, কাকচক্ষু জলের হ্রদ, মাঝে মাঝে ছবির মতো পাহাড়। এ সবেরেই মাঝে মাঝে রয়েছে অলঙ্কার প্রতিম গ্রাম, গোলাবাড়ি, বিউটিফুল বাসভবন, তারপরেই আমাদের নজর টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাজধানীর ওপর, সমুদ্রের ধারের সে এক চমকপ্রদ জাঁকজমকময় মহানগর, বন্দরে গিজগিজ করছে রকমারি জলপোত, বাণিজ্য জাহাজগুলো ভরতি হয়ে রয়েছে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীতে, পোতাশ্রয় সুরক্ষিত রাখা হয়েছে সুউচ্চ প্রাচীর আর প্রশস্ত বৃত্তাকার পরিখা দিয়ে, সবই নির্মিত হয়েছে সুবৃহৎ মাপকাঠিতে। বাড়িগুলো চলে গেছে সাগর থেকে দেশের ভেতর দিকে অনেক মাইল পর্যন্ত, আর শহরের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে খাঁজ কাটা পাঁচিল আর বুরুজওলা একটা কেল্লাপ্রাসাদ— এমনই সুবিশাল আর হুকুমদার যে মনে হয় যেন স্বপ্ন দিয়ে গড়া। তারপর আমাদের দেখানো হল সেই সব মানুষদের মুখচ্ছবি যারা একসময়ে জীবন কাটিয়ে গেছে সেই স্বর্ণযুগে, বিজ্ঞ, প্রবীণ, শ্রদ্ধেয় পুরুষ, দুর্মদ যোদ্ধা, ঋষিপ্রতিম পুরোহিত, রূপবতী সম্রান্ত আকৃতি রমণী, ফুটফুটে বাচ্চাকাচ্চা, মনুষ্যজাতির চরম পূর্ণতা।

তারপরেই এসে গেল অন্যান্য সব ছবি। দেখলাম যুদ্ধ, বিরামবিহীন সংগ্রাম, স্থলে লড়াই, জলে লড়াই। দেখলাম অসহায় উলঙ্গ মানুষদের পদদলিত অবস্থা, দেখলাম তাদের ভূলুণ্ঠিত শরীরগুলোর ওপর দিয়ে বেগে চালনা করা হচ্ছে বিশাল বিশাল রথ-শকট, অথবা ঘোড়ার পায়ের লাথিতে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে মাটির সহায়হীন মানুষরা। দেখলাম, যুদ্ধবিজেতাদের সামনে স্তূপীকৃত সম্পদ, এত ঐশ্বর্য লুঠ করা সত্ত্বেও পশুত্ব আর নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়ে রয়েছে তাদের মুখাবয়বে। দেখলাম, তাদের অবক্ষয় আর অবনতি, এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে স্থূল বস্তুর প্রতি বেশি আদর, সূক্ষ্মতার বিনাশ। ধাপে ধাপে অবনতি, অপসংস্কৃতির অগ্রগতি। বিবেকের বিনাশ, আর উজ্জ্বল উৎকট আমোদ প্রমোদের উল্লাস। এককালে যারা ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে উচ্চ স্থানে নিয়ে গেছিল, সেখান থেকে আর এক প্রজন্ম সেই সুস্থ খেলার জগতকে নিয়ে এল প্রকট পশুত্বের পর্যায়ে। পারিবারিক জীবনেও নেই আর আগেকার সেই সুস্থ, শান্ত, অনাবিল সরল ধারায় জীবন যাপনের অভ্যাস, মনের ঊর্ধ্বমুখী উচ্চচিন্তার অবকাশ— সে জায়গায় এসেছে নীচ মনোবৃত্তির প্রবণতা— এক নীচতা থেকে আর এক নীচতার দিকে ধেয়ে যাওয়া, ঐহিক আনন্দের আশার পারত্রিক মনোচর্চা বিসর্জন, কদর্য উল্লাসের নিবৃত্তি ঘটছে না কিছুতেই, না পাওয়া বিকট আমোদের আশায় ধেয়ে যাচ্ছে অধিকতর কদর্য আমোদপ্রমোদের দিকে। একদিকে উত্থান ঘটেছে অতি ধনী এক সম্প্রদায়ের যারা শুধুই ইন্দ্রিয় সুখ লালসায় উন্মত্ত, আর একদিকে ভূলুণ্ঠিত মাটির কাছের এক দল মানুষ এই কুবের সম্প্রদায়ের সেবায় আহুতি দিয়ে চলেছে নিজেদের জীবন।

আর ঠিক এই সময়ে এল প্রগতির নতুন এক তরঙ্গ। সমাজ সংস্কারকরা কৃষ্টি আর সংস্কৃতির নবীন তরঙ্গ আনতে প্রয়াস পেল সমাজের সত্য অবক্ষয়ের মধ্যে। নর্দমার পথে প্রবহমান সমাজকে তুলে নিয়ে যেতে চাইল সুদূর অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের আদতে গড়া সমাজধারায়। পর্দার বুকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম সেই সব মহীয়ান পুরুষদের, গম্ভীরবদন আত্যন্তিক প্রয়াসী আগ্রহী মহাপুরুষদের, দুর্নীতির কবলস্থ মানুষদের অপসংস্কৃতির পরিণাম বুঝিয়ে দিচ্ছে যুক্তি দিয়ে, কাকুতি মিনতি করে সুপথে ফিরিয়ে আনতে চাইছে, কিন্তু অপমানিত হচ্ছে, টিটকিরি শুনে যাচ্ছে। বিশেষ করে অপকর্মের পুরোধা হিসেবে দেখলাম 'বাল' পুরুতদের, যারা বাহ্য উৎসব আর উৎকট প্রদর্শনীর মারফত উপাসনা পদ্ধতির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে নিঃস্বার্থ আধ্যাত্মিক প্রগতি থেকে

জাঁকজমক আর লোক দেখানো প্রদর্শনী ভিত্তিক পূজা পদ্ধতির দিকে। সংস্কৃতির বাহক যারা, সংস্কৃতির ধারক যারা— এই সব ভণ্ড পুরুতরা হেয় করে যাচ্ছে তাদেরকে। কিন্তু পশুশক্তি আর টিটকিরি বিদ্রুপ দিয়ে কৃষ্টিমান মানুষদের দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না। একনাগাড়ে তারা চেষ্টা চালিয়ে সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক আর সামাজিক প্রগতির উন্নয়নে বদ্ধপরিকর, পরিণাম হচ্ছে অতি ভয়ংকর। হুঁশিয়ারি আর আক্রমণ আসছে নানাদিক থেকে। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রগতির ধারক আর বাহকরা সতর্ক করে দিচ্ছে অধোগামী মানুষদের এই বলে যে, শেষের সেদিন ভয়ংকরতম হতে চলেছে— যে ভয়ানক পরিণতি থেকে পরিত্রাণ নেই কারোরই। অতি ভয়ংকর শেষদিনের সেই ছবির পূর্বাভাস তারা পাচ্ছে তাদের অতীন্দ্রিয় অতি অনুভূতি দিয়ে। শ্রোতাদের কেউ কেউ ভীত হয়ে নিবৃত্ত হতে চাইছে নিম্নগামী জীবনধারা থেকে, অন্যান্যরা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে অধিকতর পাপ কাজে নিমগ্ন থাকছে। মহাপ্রলয়ের পথকে প্রশস্ততর করে তুলছে। গোটা দেশটার আসন্ন দুর্ভাগ্যকে দ্রুততর করে যাচ্ছে।

তারপরেই দেখলাম অদ্ভুত একটা দৃশ্য। এগিয়ে এলেন এক সমাজ সংস্কারক। রীতিমতো শক্তিমান, মনের আর শরীরের দিক দিয়ে। নেতৃত্ব দিলেন প্রগতিবাদীদের। তাঁর ছিল ঐশ্বর্য, প্রভাব প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা— পরে দেখা গেছিল সেই শক্তি পুরোপুরি পার্থিব শক্তি নয়। তাঁকে দেখতে পেলাম যেন ধ্যান নিমগ্ন সম্মোহিত অবস্থায় উচ্চতর বিদেহীদের সঙ্গে কথোপকথন করে যাচ্ছেন, যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছেন। দেশব্যাপী সমস্ত বিজ্ঞানের অভ্যুত্থান ঘটেছিল এঁরই দৌলতে— সে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে থাকা বিজ্ঞান, সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের নাগালের অনেক বাইরের বিজ্ঞান, এঁরই প্রচেষ্টায় নির্মিত হল একটা মহাপোত আসন্ন দুর্দিনের সময়ে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে। দেখতে পেলাম, অগণিত মানুষ সচেষ্ট রয়েছে সেই মহাপোত নির্মাণের মহাকর্মে। দেখলাম, গাঁথা হচ্ছে অনেক উঁচু উঁচু দেওয়াল— মূর্খ অবিশ্বাসীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছে আর ব্যঙ্গবিদ্রুপের মন্তব্য করে যাচ্ছে— যেন আহাম্মকরা বৃথাই খেটে মরছে এই মহাযজ্ঞে। দেখতে পেলাম, বেশ কিছু ব্যক্তি সেই মহামানবকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইছে, মহাপ্রলয়ের ভয়ে এত কাণ্ড না করে নিরাপদ কোনও জায়গায় চম্পট দিলেই তো হয়। অযথা এত এলাহি কাণ্ডকারখানার প্রয়োজনটা কী! তাঁর জবাব, যতদূর অনুধাবন করতে পারলাম তা এই : শেষ মুহূর্তে বেশ কিছু মানুষকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও, নতুন দেবালয় যাতে সুরক্ষিত থাকে, সে

ব্যাপারটাও তো দেখতে হচ্ছে তাঁকে। সেই মন্দিরে থেকেই তো পরিত্রাণ পেয়ে যাবে তাঁর নির্বাচিত অনুগামী কিছু মানুষ। ইতিমধ্যে সেইসব ভক্তদের তিনি জড়ো করে রেখে দিলেন নতুন গড়া দেবমন্দিরের মধ্যে— কেননা, শেষের প্রহর ঠিক কোন সময়ে, তা তাঁর নিজেরই জানা ছিল না। নিশ্চিতভাবে কিন্তু জানতেন মরলোকের মানুষদের আওতার বাইরের এক মহাশক্তি এই মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দেবে অচিরে। তাই মহাপোত নির্মাণ যখন সমাপ্ত হয়েছিল, জল নিরোধক কপাট তৈরি যখন শেষ হয়েছিল, যাচাই-পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল, তখন তিনি তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, চাকর বাকর আর অনুগামীদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই মহাপোতের অভ্যন্তরে।

শেষের সেদিন এল তারপর ভয়ানক ঘনঘটার মধ্যে দিয়ে। শিহরিত হয়েছিলাম সেই দৃশ্য পর্দার ছবির মধ্যে দর্শন করেও। ঈশ্বর জানেন আদতে তা কী। প্রথমে দেখলাম জিলজিলে পাতলা একটা পর্বত অবিশ্বাস্য উচ্চতায় উঠে গেল প্রশান্ত সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে। তারপর দেখলাম ভয়ানক গতিবেগে একটা আকাশচুম্বী চকচকে পর্বত ধেয়ে যাচ্ছে জনপদের পর জনপদের ওপর দিয়ে, মাইলের পর মাইল, ফেনার মুকুট মাথায় দিয়ে, ক্রমশ বর্ধমান গতিবেগ নিয়ে। তুষারধবল সেই পর্বতচূড়ার সন্নিকটে এসে তলিয়ে গেল দু-খানা কাঠের জাহাজ। তারপরেই দেখলাম, সেই পর্বত উপকূলে ধাক্কা মেরে অগ্রসর হয়ে চলেছে মাইলের পর মাইল ধরে অগণিত জনপদের ওপর দিয়ে। টর্নেডোর সামনে যেমন

তাসের বাড়ির মতো উড়ে যায় বাড়ি-ঘরদোর, ঠিক তেমনি অবস্থা হচ্ছে লোকালয়গুলোর। আমরা দেখলাম, বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আতঙ্ক প্রকট চোখমুখ নিয়ে বহু মানুষ বিহ্বলভাবে দেখে যাচ্ছে আগুয়ান প্রলয়ঙ্কর আতঙ্ককে। এরাই সেই সব মানুষ যারা সতর্কবাণী উপেক্ষা করে বিদ্রুপের হাসি হেসে মহামানবকে এক সময়ে বিস্তর হেনস্থা করেছিল। এখন তারা করজোড়ে ব্যাকুল মুখে ভয়ার্ত চোখে আবেদন জানাচ্ছে আগুয়ান ধ্বংস দূতকে। মহাপোতের কাছে পৌঁছোবার সময় আর নেই, সে জাহাজ ভাসছে শহর থেকে অনেক তফাতে, এতদ্‌সত্ত্বেও হাজারে হাজারে মানুষ ধেয়ে যাচ্ছে বন্দর-নগরে। পেল্লায় কেল্লা প্রাসাদ গিজগিজ করছে তাদের ভিড়ে। আর তারপরেই আচমকা শুরু হল সমস্ত কেল্লাপ্রাসাদের জলে তলিয়ে যাওয়া। মাটির মধ্যেকার অলিগলি দিয়ে জল ঢুকে গেছে কেল্লা-প্রাসাদের মস্ত চুল্লি যেখানে— সেইখানে, ক্ষণপরেই প্রবল এক বিস্ফোরণে রেণু রেণু হয়ে গেল গোটা প্রাসাদের ভিত। প্রাসাদ ডুবছে, সেই সঙ্গে ডুবছে সমস্ত মানুষ। মাটির তলায় তলায় জল ঢুকে যেতেই কেন্দ্রীয় চুল্লি ফেটে উড়ে গেল, ডুবে যেতে লাগল গোটা শহরটা। ভয়ানক সেই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠেছিলাম আমরা তিনজনে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকে। মস্ত বন্দরটা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে তলিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া হল অত বড় জাহাজঘাট। মস্ত উঁচু আলোকস্তম্ভ দু-টুকরো হয়ে ছিটকে গেল দু-দিকে। ডুবছে শহর, ডুবছে— ডুবছে জলতলে— যা দেখে শুধু আমরা ক-জনেই চেঁচিয়ে উঠিনি— চেঁচিয়েছিল প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকে। ভয়ানক সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলেও যে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। সারি সারি ভবনগুলোর ছাদ কিছুক্ষণের জন্যে জেগেছিল জল থেকে ঠেলে ওঠা দ্বীপসমূহের মতো— তারপর সে সব বস্তু জলতলে অন্তর্হিত হল অবশেষে। সুবিশাল সেই কেল্লা-প্রাসাদের শীর্ষদেশ কিছুক্ষণের জন্যে হেলে পড়ে জলপৃষ্ঠ থেকে ডুবন্ত দ্বীপের মতো মাথা উঁচিয়ে ছিল বটে, ক্ষণপরেই তাকেও অন্তর্হিত হতে হল জলের মধ্যে— দেখা গেল শুধু ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত মানুষের ব্যাকুলভাবে শেষ হাতনাড়া। শেষ হয়ে গেল লোমহর্ষক নাটক, গোটা মহাদেশটার ওপর উন্মত্ত নৃত্য করে গেল থই থই সমুদ্র— যে সমুদ্রে প্রাণের সাড়া নেই কোথাও— ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেবল অগণিত আসবাবপত্র সমেত অবিশ্বাসী মহাপাপী মানুষদের আর অসহায় জীবজন্তুদের। আস্তে আস্তে সে সবেরও শেষ হয়ে যাওয়া দেখলাম, অবশেষে রইল

শুধু দিগন্তব্যাপী থইথই মহাসমুদ্র— এত কিছু গ্রাস করেও যে পরম প্রশান্ত। ঈশ্বরের দণ্ড এমনই অকরুণ। পরিত্রাণ নেই অবিশ্বাসী কোনও মহাপাপীর।
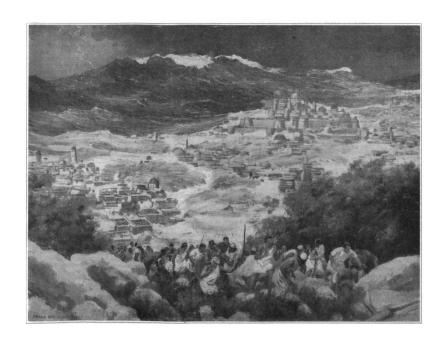
সমাপ্ত হল সুদূর অতীতের কাহিনি। সবই দেখা হয়ে গেল, প্রশ্নের জন্যে অবিশিষ্ট রইল না কিছুই। বাকিটুকু কল্পনা করে নিজেদের মগজ খাটিয়ে কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে, বুঝে নিলাম কীভাবে একটু একটু করে জলতলে নিমজ্জিত হয়েছে মস্ত মহাদেশ আগ্নেয় উদ্গিরণের তালে তালে জলতলে, যাদের শীর্ষদেশ আজও রয়েছে উচ্চাবস্থায়। মনের চোখ দিয়ে দেখে নিলাম সুবিস্তৃত সেই মহাদেশ পতিত হয়ে রয়েছে যে মহাসাগরের তলদেশে, তার নাম আটলান্টিক মহাসমুদ্র। দেখতে পেলাম চুরমার হয়ে যাওয়া শহরের একপ্রান্তে আজও টিকে আছে মহামানব নির্মিত সেই উদ্বাস্তু কলোনি যা তিনি গড়ে দিয়েছিলেন দূরদৃষ্টির দৌলতে— যাঁর বিজ্ঞান আজও বহাল তবিয়তে রেখে দিয়েছে মুষ্টিমেয় ভক্তবৃন্দের বংশধরবৃন্দকে। সংখ্যায় তখন তারা ছিল পঞ্চাশ-ষাট জন— পুরুষানুক্রমে আজ তারাই নিমজ্জিত আটলান্টিস মহাদেশের বাসিন্দা। সারবন্দি এইসব ছবি থেকে জানা গেল পৃথিবীর কোনও গ্রন্থাগারে বসে মস্তিষ্ক চর্চা করলেও তা জানা যেত না। নিয়তির মার এমনই অমোঘ। একদিন হয়তো নিয়তির নির্দেশেই আর এক ভূগর্ভ উত্থানের ফলে

নিমজ্জিত এই মহাদেশ জলতল থেকে উঠে আসবে জলপৃষ্ঠে, সূচিত হবে আর এক মহা-ইতিহাস।

একটা বিষয়ই কেবল নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি— বিয়োগান্তক এই পরিণতি ঘটতে লেগেছিল কত সময়। মোটামুটি একটা হিসেব বের করার পদ্ধতি মাথায় এনেছিলেন ডক্টর ম্যারাকট। বিশাল সৌধ সংলগ্ন বহু লাগোয়া মস্ত অট্টালিকার একটার নিচে আছে সুবিশাল একটা পাতাল প্রকোষ্ঠ— নিঃসন্দেহে দলপতিদের কবরখানা। মিশর আর ইউকাটান-এর মতো এখানেও মমিকরণ পদ্ধতি চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে, মাটির তলার এই টানা লম্বা প্রকোষ্ঠের দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে গর্ত কেটে রক্ষিত ছিল সারবন্দি সীমাহীন মমিদেহ— অতীতের বুকচাপা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি স্বরূপ। ম্যান্ডা সগর্বে দেখিয়েছিল দেওয়াল খাঁজের সব শেষ কোটরটা, বুক ফুলিয়ে জানিয়ে ছিল— এ জায়গা বিশেষভাবে রাখা হয়েছে তারই মরদেহের শেষকৃত্যের জন্যে।

পেশাদারি ঢঙে বলেছিলেন ম্যারাকট, 'ইউরোপীয় নৃপতিদের গড় আয়ু হিসেব করলে দেখা যাবে, তাঁরা এক শতাব্দীতে পাঁচজনের বেশি। একই হিসেব প্রয়োগ করা যেতে পারে এখানেও। বৈজ্ঞানিক সঠিকতা না পেতে পারি, তবে একটা আন্দাজি হিসেব পেতে পারি। মমিদের সংখ্যা আমি শুনেছি— চারশো জন।'

'সময়ের হিসেবে তাহলে আট হাজার বছর?'

'এগজ্যাক্টলি। তাতেই প্লেটোর আন্দাজি হিসেব কিছুটা মিলে যাচ্ছে। মহাপ্রলয়ের সূচনা ঘটেছিল মিশরীয় নথি লিখনের আগে, সে সময়টা আজ থেকে ছয় আর সাত হাজার বছর আগে। তবে কি, এরকম বিস্তীর্ণ সভ্যতা গড়ে তুলতে সময় লেগেছিল নিশ্চয় বহু হাজার বছর। এই হিসেবের ভিত্তিতেই আমার দাবি পেশ করছি আপনাদের সামনে— ইতিহাস রচয়িতারা কেউ যা করতে পারেননি, আমি তা করতে পেরেছি— ইতিহাস শুরুর সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পেরেছি।'

সমাধিস্থ শহর দেখে আসবার পর আন্দাজি হিসেবে প্রায় একমাস বাদে আমাদের সাগরতলের জীবনধারায় সংযোজিত হল সবচেয়ে বিস্ময়কর আর অপ্রত্যাশিত ব্যাপারস্যাপার। আর কোনও কিছুই তেমন বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটাতে আর পারবে না— বিস্ময় নামক ব্যাপারটা আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে— এমন একটা ধারণা আমাদের মনের মধ্যে শেকড় গেড়ে বসে গেছিল। চমকে ওঠার মতো যেন কিছুই আর নেই। কিন্তু এরপরেই ঘটনাটার আভাসটুকুও যে কল্পনায় আনতে আমরা অসমর্থ ছিলাম, তা আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেল মনের মধ্যে বেশ খানিকটা ঝাঁকুনি সৃষ্টি করে।

খবরটা নিয়ে এসেছিল স্ক্যানলান— বিরাট কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। বুঝতেই পারছেন, এই সময়ে আমরা মোটামুটি খোলাখুলিভাবে সুবৃহৎ বিল্ডিং-এর সর্বত্র যাতায়াত করতে পারতাম। সাধারণের বিশ্রাম কক্ষ কোথায়, আমোদ প্রমোদের ঘরগুলো কোথায়— সে সব জানা হয়ে গেছিল। কনসার্ট বাজনা পর্যন্ত শুনেছি গানের আসরে গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে, বুঝেছি এদের সঙ্গীতবোধ বড় অদ্ভুত এবং এলাহি। দেখেছি থিয়েটার অঙ্গনের আমোদপ্রমোদ, যেখানকার দুর্বোধ্য শব্দগুলোর তর্জমা ঘটানো হয়েছে বিপুল অঙ্গভঙ্গী আর নাটকীয় ইশারা ইঙ্গিত মারফত। বলতে গেলে, গোটা সম্প্রদায়টার অঙ্গে অঙ্গে মিশে গেছিলাম আমরা ক-জনে। বহু ফ্যামিলির প্রাইভেট ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাদের জীবনধারা দেখেছি— আমার নিজের তরফ থেকে বলা যায়— অদ্ভুত আশ্চর্য এই সব মানুষদের সংস্পর্শে এসে কিছুটা ঝাঁ-চকচকেও হয়ে উঠেছি— বিশেষ করে সেই মহিলাটির কাছে, যার নাম উল্লেখ করেছি আগেই। সাগরতলের অত্যাশ্চর্য এই প্রজাতির অন্যতম এক দলপতির কন্যা ছিল সে, নাম তার মোনা (মোনালিসা নয়)। এর বাড়িতে গেলেই আমি পেতাম বিশেষ রকমের বিপুল অভ্যর্থনা— যা এই প্রজাতির স্বভাব চরিত্রে নিহিত। তখন আর আমাকে কেউ অন্য প্রজাতির মানুষ বলে মনে করত না— যেন বাড়ির লোক। এমনকী ভাষার অন্তরায়ও আর কোনও ব্যবধান থাকত না। খুবই মৃদু অন্তরের ভাষার যখন প্রয়োজন হত, তখনও কিন্তু প্রাচীন আটলান্টিস আর বর্তমান আমেরিকার মধ্যে কোনও অন্তরায় থাকত না। জলতলের এই সুকন্যার মনোরঞ্জনের জন্যে যা-যা

প্রয়োজন, ব্রাউন্স কলেজ-এর ম্যাসাচুসেট কন্যাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেইগুলোরই যে প্রয়োজন হয়, সে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছিলাম।

এইবারে আসা যাক স্ক্যানলানের হন্তদন্ত হয়ে একদিন আমাদের ঘরে আসার ব্যাপারটায়— খবর এনেছিল মস্ত একটা ব্যাপারের।

বোমার মতো ফেটে পড়েছিল ঘরে ঢুকেই— দারুণ ব্যাপার! লোকটা জলের তলা থেকে ঘরে ঢুকেই হাউমাউ করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। উত্তেজনার চোটে কাচের মুখোশ খুলতেও ভুলে গেছিল। তাই তো প্রথম দিকের কথাগুলো কিছু শুনতে পাওয়া যায়নি। তারপরেই হুড়মুড় করে ফের বেরিয়ে গেল দোস্তদের নিয়ে। ব্যাপারটা তো তাহলে আমাদেরও দেখা দরকার।

শুনেই, দৌড়ে বেরিয়ে গেছিলাম ঘর থেকে। দেখেছিলাম, গলিপথ বেয়ে বিষম উত্তেজিত অবস্থায় ছুটছে আমাদের বন্ধুবর্গ বিবিধ অঙ্গভঙ্গীসহ। আমরাও ভিড়ে গেলাম তাদের সঙ্গে। দল বেঁধে ছোটখাটো একটা শোভাযাত্রা করে হেঁটে চললাম সাগরের তলা দিয়ে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে উত্তেজিত সেই বার্তাবাহক। যাচ্ছে যে গতিবেগে, সেই গতিবেগে ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা নেই বলে পেছিয়ে পড়লেও তাদের হাতের ইলেকট্রিক লণ্ঠন থাকায় পেছন পেছন লেগে থাকতে অসুবিধে হয়নি। পথ পরিক্রমা করে যাচ্ছি আগের মতোই খাড়াই আগ্নেয় পাহাড়ের কিনারা দিয়ে। অচিরে এসে গেলাম এমন একটা জায়গায় যেখান বহু পদক্ষেপে ক্ষয়ে গর্ত হয়ে যাওয়া সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে ওপরদিকে চূড়োর দিকে। তরতর করে উঠে গেছিলাম সোপান শ্রেণী বেয়ে, এসে পড়েছিলাম এবড়োখেবড়ো এমন একটা অঞ্চলে যেখানে অগুন্তি খোঁচা খোঁচা চুড়ো মাথা উঁচিয়ে রয়েছে যত্রতত্র এমনভাবে যে পথ চলাই দুষ্কর। সুপ্রাচীন লাভার এই সব কেরামতির জটাজাল থেকে কোনওমতে বেরিয়ে এসে গেছিলাম একটা স্বতঃদীপ্ত গোলাকার প্রান্তরে, ঠিক মাঝখানে পড়ে থাকা বৃহদাকার বস্তুটা দেখে পিলে চমকে গেছিল আমার। দুই সঙ্গীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখেছিলাম দু-জনেই মুখের পরতে পরতে পরিস্ফুট একই কৌতুকাবহ বিস্ময়বোধ। আবেগ মথিত অন্তর প্রত্যেকেরই।

কর্দমপঙ্কে অর্ধেক গাঁথা অবস্থায় রয়েছে একটা বৃহদাকার স্টিমার। শুয়ে আছে পাশ ফিরে, চিমনি ভেঙে গিয়ে কাত হয়ে রয়েছে একদিকে, ভেঙে গেছে মূল মাস্তুল, এছাড়া প্রায় আস্ত বলা চলে জাহাজটাকে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জেটি ছেড়ে যেন সবে

বেরিয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপে কাছে গেছিলাম প্রত্যেকেই। গলুইয়ের কাছে গিয়ে দেখেছিলাম। মানসিক অবস্থা হয়েছিল ভাষায় অবর্ণনীয়। কেননা, নামটা এই— "স্ট্র্যাটফোর্ড লন্ডন"! ম্যারাকট ডিপ-এ আমাদের পেছন পেছন চলে এসেছে আমাদেরই জাহাজ।
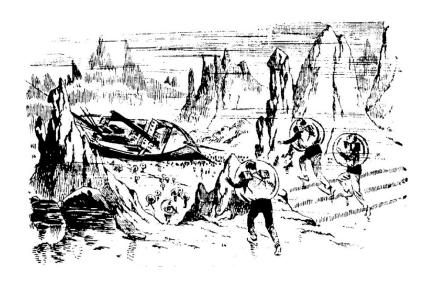
বিষম বিস্ময়ে স্থানু হয়ে গেছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। ঘোর কেটে গেছিল একটু পরে। মনে পড়ে গেছিল ব্যারোমিটারের সংকেত, পালগুলোর নেতিয়ে পড়া, দিগন্তের অদ্ভুত কৃষ্ণকায় মেঘ পুঙ্গবদের দঙ্গল। আচমকা অতি প্রলয়ঙ্কর এক সাইক্লোন নিশ্চয় ধেয়ে এসেছিল সর্বশক্তি নিয়ে— খপ্পর থেকে নিষ্কৃতি পায়নি "স্ট্র্যাটফোর্ড"! যাত্রীরা অবশ্যই নিহত হয়েছে প্রত্যেকেই, কেননা সব ক-টা লাইফবোট রয়েছে যে যার জায়গায়, তাছাড়া সাইক্লোন যখন মহাপ্রলয় রচনা করে ধেয়ে আসে, তখন লাইফবোটও আস্ত থাকে না। মনে তো হল, আমাদের নিজেদের ভাগ্য বিপর্যয়ের দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই "স্ট্র্যাটফোর্ড"-এর সলিল সমাধি ঘটেছে। জলতল মাপবার জন্যে সিসের যে ওজনটা নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, হয়তো সেই ওজন ডেকের ওপর তুলে নেওয়ার পরেই হারিকেন ঝড়ের হাওয়ায় নাস্তানাবুদ "স্ট্র্যাটফোর্ড" জলতলে চলে গেছিল। খুবই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাগ্যের কী বিড়ম্বনা! আমরা জলে ডুবে অক্কা পেয়েছি মনে করে যারা বিষাদগ্রস্ত হয়েছিল, তারাই জলতলে প্রাণ দিল— আমরা রইলাম বেঁচে।

ক্যাপ্টেন হোয়ি নিশ্চয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শক্ত হাতে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জাহাজ ডুবেছে তাঁকে আর ইঞ্জিন ঘরে যারা আগুনে কয়লা চালান করছিল তাদের নিয়ে।

আমাদের ইচ্ছানুসারে তাদের প্রত্যেককে ভাঙা জাহাজ থেকে এনে কবরস্থ করা হয়েছিল সমুদ্রতলের একটা সামুদ্রিক ঝোপের পাশে। এত কথা খুঁটিয়ে লিখলাম এই কারণে যে, যদি আমার এই লেখা মিসেস হোয়ি-র চোখে পড়ে, তিনি অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা তো পাবেন। কয়লা চালান করছিল ইঞ্জিনের চুল্লীতে যারা, তাদের নাম আমার জানা নেই।

এহেন কর্তব্য-কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা যখন ব্যাপৃত, খুদে মানবরা তখন ছেয়ে ফেলেছে গোটা জাহাজটাকে। চোখ তুলে ওপরদিকে চেয়ে দেখেছিলাম তারা থুকথুক করছে জাহাজের সব জায়গায়— এক ডেলা মাখনের ওপর এক পাল ইঁদুরের মতো, তাদের উত্তেজনা দেখে বুঝে নিলাম, এ রকম বাষ্পীয় পোত বা আধুনিক জাহাজ দেখছে তারা এই প্রথম। অর্ধস্বচ্ছ কাচের বর্মের মধ্যে অক্সিজেনের জোগান সীমিত বলেই মূল ঘাঁটি থেকে এতদূরে বেশিক্ষণ থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঝটপট হাত চালিয়ে ভাঙচুর করে যা যা নেবার নিয়েছে। আমরাও আমাদের কেবিনে গিয়ে কিছু জামা কাপড় আর বই-টই নিয়ে এসেছিলাম— তখনও পর্যন্ত আস্ত অবস্থায় যা যা পাওয়া গেছিল।

জাহাজ থেকে পাওয়া অনেক কিছুর মধ্যে ছিল “লগবুক”, যে জাহাজি ডায়েরিতে শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাবতীয় বিপর্যয়ের বৃত্তান্ত বিশদভাবে লিখে গেছেন ক্যাপ্টেন মহাশয়। সেই লেখা এখন আমরা পড়ছি, এইটাই তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার। যিনি লিখেছিলেন, তিনি কিন্তু বেঁচে নেই। সেদিনের কাহিনি লেখা আছে এইভাবে:

*
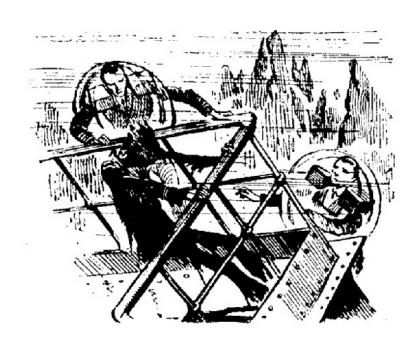
'তেসরা অক্টোবর। তিন কাঠগোঁয়ার, কিন্তু অতীব দুঃসাহসী, আমার নিষেধে কান না দিয়ে আজ নেমে গেল সাগরের তলায়— ইস্পাতের বাক্সের মধ্যে ঢুকে। যে দুর্ঘটনা ঘটবে বলে ভয় পেয়েছিলাম, ঠিক তা-ই ঘটেছে। তাদের আত্মার শান্তি হোক। জলে নেমে গেছিল সকাল ১১টায়। ওই সময়ে জলে নামার অনুমতি দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না, কেননা দিগন্তে ঘন হচ্ছিল ঝড়ের সংকেত। বিদায় জানিয়ে ছিলাম তা সত্ত্বেও একটাই মনোভাব নিয়ে— এই দেখাই শেষ দেখা। প্রথম দিকে সবই ছিল ঠিকঠাক, এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ইস্পাতের বাক্স নেমে গেছিল তিনশো ফ্যাদম গভীরতায়। ডক্টর ম্যারাকট যে ক-টা বার্তা পাঠিয়েছিলেন, প্রত্যেকটাই ছিল শুভ। তারপরেই তাঁর কণ্ঠস্বরে পেলাম উত্তেজনার আভাস, তাদের কাছিও দুলছিল দারুণভাবে। কাছি ছিঁড়ে গেল ঠিক তার পরেই। মনে হয় ওই সময়ে গভীর কোনও খাদে গিয়ে পড়েছিল ইস্পাতের বাক্স, কেননা ডক্টর আস্তে আস্তে কাছি টেনে নিয়ে যেতে বলছিলেন। প্রায় আধমাইল পর্যন্ত বাতাসের নল ছিল আস্ত, তারপর তাও গেল ছিঁড়ে। এরপর থেকে ডক্টর ম্যারাকট, মিস্টার হেডলে আর মিস্টার স্ক্যানলান-এর আর কোনও বার্তা পাইনি।

তা সত্ত্বেও একটা অত্যাশ্চর্য বিষয় লিপিবদ্ধ না করে পারছি না, ছাব্বিশ হাজার ছ-শো ফুট গভীরতা থেকে তুলে আনা হয়েছিল একটা সিসের ওজন। কাছিতে বাঁধা ছিল মিস্টার হেডলের নামাঙ্কিত একটা রুমাল। জাহাজের সব্বাই বিমূঢ়। ভেবে পাচ্ছে না এমনটা হয় কী করে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর কাছি টেনে তুলেছিলাম— দেখেছিলাম ছেঁড়া প্রান্ত। এবার জাহাজ নিয়ে ভাবা যাক। এরকম দুর্যোগের আভাস কখনও দেখিনি। ব্যারোমিটার এসে দাঁড়িয়েছে ২৮.৫-এ, আরও নামছে।

জাহাজি সঙ্গীদের শেষ সংবাদ পেলাম এই ভাবেই। ভয়ানক এই সাইক্লোনের খপ্পরে পড়ে জাহাজ তলিয়ে গেছে এর ঠিক পরেই। ধ্বংসাবশেষের কাছে ছিলাম ততক্ষণ, যতক্ষণ না অর্ধস্বচ্ছ কাচের খোলসের মধ্যে অক্সিজেন একটু একটু করে কমে এসে আমাদের প্রাণান্ত ঘটানোর উপক্রম করেছিল। ফেরবার পথে পড়েছিলাম এমন একটা আচমকা বিপদের খপ্পরে যা থেকে বুঝে নিয়েছিলাম এতকাল সমুদ্রতলের বাসিন্দা হয়েও

কেন এদের জনসংখ্যা তেমনভাবে বাড়েনি। গ্রিক গোলাম সমেত এদের সংখ্যা বড়জোর চার থেকে পাঁচ হাজার। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে আগ্নেয় পাহাড়ের কিনারা বরাবর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরেই ম্যান্ডা আঙুল তুলে দেখিয়েছিল মাথার ওপর দিকে, একই সঙ্গে আমাদেরই দলের একজনকে পাগলের মতো ইশারা করেছিল জঙ্গলের মধ্যে চলে আসার জন্যে— সে লোকটা দলছাড়া হয়ে এগিয়ে গেছিল একটু খোলা জায়গায়। একই সঙ্গে ম্যান্ডা নিজে দলবল সমেত তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল মস্ত একটা পাথরের চাঁইয়ের তলায়। সেখানে যাওয়ার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম নিদারুণ এহেন আতঙ্কের কারণটা কী। আমাদের মাথার ওপর দিকে একটু দূর থেকে দ্রুত নেমে আসছিল অদ্ভুত গড়নের একটা মাছ। ফুলো আর চ্যাপটা, তলার দিকটা সাদাটে, কিনারা বরাবর লালচে আভা— যার কম্পন আর আলোড়ন বিকট মীন মহাশয়কে দ্রুত নামিয়ে আনছিল নিচের দিকে। সে মাছের চোখ মুখ কিছু আছে বলে মনে হল না, কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল তার শিহরণ জাগানো ক্ষিপ্রতা। যে সঙ্গী একটু দূরে ছিটকে গেছিল, মাথার ওপরে দ্রুত নেমে আসা ভয়ানক দর্শন মীন মহাশয়কে দেখেই সে দৌড় দিয়েছিল আমাদের দিকের পাথরের গোল চাইটা লক্ষ করে, কিন্তু বড় দেরি করে ফেলেছিল। দূর থেকে দেখেছিলাম তার আতঙ্ক বিস্ফারিত চক্ষু যুগল যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, নিদারুণ ভয়ে মুখভাব বিকৃত হয়ে গেছে।

ভয়ানক দর্শন প্রাণীটা নিমেষের মধ্যে গ্যাঁট হয়ে চেপে বসে গেছিল বেচারার ওপর সব দিক দিয়ে যাতে কোথাও ফাঁকা না থাকে, ঠিকরে বেরিয়ে যেতে না পারে। গায়ে কাঁটা জাগানো ভঙ্গিমায় স্পন্দন জাগিয়ে গেছিল সর্ব অবয়বে এমনভাবে যেন নিচের মানুষটাকে পিষে ফেলছে প্রবাল পাথরের ওপর। পুরো বিয়োগান্তক দৃশ্যটা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছি, সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। তা সত্ত্বেও আতঙ্কে অবশ্য সঙ্গীরা দাঁড়িয়েছিল কাঠ হয়ে— মরণের পথে আগুয়ান সঙ্গীকে বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে যায়নি। স্ক্যানলান কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে পারেনি। ধেয়ে গেছিল সামনে, লাফিয়ে উঠে পড়েছিল মহাকায় বিকটাকার আতঙ্কের নরম চওড়া পৃষ্ঠদেশে, হাতের ছুঁচোলো শড়কি দিয়ে খুঁচিয়ে গেছিল নির্মমভাবে।

অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ছিটকে গেছিলাম স্ক্যানলান-এর পাশে। তারপরেই এসে গেছিলেন ম্যারাকট, দলের বাকি সবাই তখন একযোগে জলরাক্ষসকে আক্রমণ করতেই সে বেচারা

আস্তে আস্তে ভেসে উঠেছিল ওপর দিকে তেলতেলে আঠালো একটা বস্তুর নিষ্ক্রমণ ঘটিয়ে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছিলাম। বিশাল সাগর দানবের দেহভারেই ভেঙে গেছিল হতভাগ্য আটলান্টিয়ানের অর্ধস্বচ্ছ স্ফটিক হেলমেট— মারা গেছিল জলতলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। মৃতদেহ নিয়ে ফিরে আসবার পর একদিকে যেমন শোকস্তব্ধ হয়েছিল গোটা তল্লাটটা, আর একদিকে হিরো হয়ে গেছিলাম আমরা তিনজনে। অদ্ভুত সেই মৎস্য সম্বন্ধে ডক্টর ম্যারাকট পরে যা মন্তব্য করেছিলেন, তা এই: কম্বল মাছের নয়া নিদর্শন। মৎস্যবিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এহেন মৎস্য যে এমন বৃহদাকার হয়, তা ছিল তাঁর ধারণাতীত।

ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখলাম বিয়োগান্তক হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে। কিন্তু অত্যাশ্চর্য যে প্রাণপ্রবাহ সাগরতলে দেখেছি, তা নিয়ে একটা গ্রন্থ রচনার অভিলাষ আমার আছে। এখানে দেখছি লাল আর কালো রং দুটোরই দাপট বেশি— জানি না কেন সমুদ্রের গভীরের প্রাণীমহলে এই বর্ণদুটোর এত প্রাধান্য। গাছপালা কিন্তু জলপাই রঙের, খুবই ফিকে। কিন্তু এমনই মজবুত যে সমুদ্রতলে ট্রলার নামিয়েও ছিঁড়ে আনা যায় না। বিজ্ঞানীদের তাই বিশ্বাস হয়ে গেছে, সমুদ্রের তলাটা বোধ হয় এক্কেবারে ন্যাড়া, অনুর্বর উদ্ভিদের ঠাঁই নেই সেখানে।

সাগর জীবেদের অনেকেই অসাধারণ সুন্দর, অন্যান্যরা এমনই কিম্ভূতকিমাকার যে যেন তারা দুঃস্বপ্নলোকের আততায়ী, ভয়ানক বিপজ্জনক, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা নেই স্থলভূমির খোদ শয়তান-প্রতিম আতঙ্ক জাগানো প্রাণীদেরও। তিরিশ ফুট লম্বা একটা হুল-রশ্মি প্রাণী আমি দেখেছি, গায়ের রং মিশকালো, লেজে রয়েছে এমনই ভয়ানক দাঁড়া যার এক ঘায়েই পরলোকে প্রস্থান করবে ধরাতলের যে কোনও জীব। ব্যাঙের মতো একটা প্রাণী দেখেছি যার ড্যাবডেবে সবুজ চোখ ঠেলে বেরিয়ে থাকে শরীরের বাইরে, গোটা শরীর জুড়ে রয়েছে ব্যাদিত মুখবিবর— খোলা হাঁ-য়ের মধ্যে টেনে নেয় মনের মতো খাদ্য। চালান করে যে উদরের মধ্যে, তার সাইজ অতি বিরাট। হাতে ইলেকট্রিক মশাল না থাকলে এমন জীবের সম্মুখীন হওয়া আর যমালয়ে যাওয়া একই ব্যাপার। আমি দেখেছি বিলকুল অন্ধ লাল টকটকে বান মাছ— যারা ঘাপটি মেরে থাকে পাথরের আনাচে কানাচে — প্রাণ হরণ করে করাল বিষ ছিটিয়ে দিয়ে। দানবসদৃশ বিরাটকায় সামুদ্রিক কাঁকড়াবিছেও আমি দেখেছি, যা কিনা জলতলের অন্যতম আতঙ্ক, দেখেছি ডাইনি মৎস্য— যারা ঘাপটি মেরে থাকে সাগরতলের অরণ্যের আঁধারে।

একবার তো সাগরতলের সত্যিকারের সমুদ্র সরীসৃপ দেখবার সুযোগও আমার হয়েছিল। এমন প্রাণী কদাচ আসে মানব চক্ষুর সামনে। কারণ, এর নিবাস জলের অতি গভীরতায়। জলতলে যদি কখনও প্রাকৃতিক খিঁচুনি আরম্ভ হয়, তখনই শুধু ঠিকরে আসে জল পৃষ্ঠে। মোনা আর আমি একদিন স্তরীভূত কোলেনকাইমা স্তবকের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। দুটো সাগর-আতঙ্ক পিছলে পিছলে চলে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। আকারে তারা অতিকায়— উচ্চতায় প্রায় দশ ফুট, লম্বায় দুশো ফুট। ওপর দিকটা মিশকালো, তলার দিকটা রুপোলি সাদা, পিঠে খাড়াই ঝালর। চক্ষুযুগল কিন্তু একটা ষাঁড়ের চোখের চাইতে বড় নয়। এর সম্বন্ধে এবং আরও অনেক বিদঘুটে প্রাণী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাবে ডক্টর ম্যারাকটের লেখার মধ্যে, সে লেখা যদি কখনও পৌঁছোয় তোমাদের হাতে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ পিছলে পিছলে বেরিয়ে গেছে নতুন এই জীবন ধারায়। খুব মজায় ছিলাম। দিনগুলো ফুরফুর করে কেটে যাচ্ছিল। বহুবিস্মৃত এদের ভাষার টুকটাক শিখেও নিচ্ছিলাম। ফলে, সঙ্গীদের সঙ্গে বাক্যালাপে অসুবিধে হচ্ছিল না। অধ্যয়ন আর আমোদপ্রমোদের বিষয়ের তো শেষ ছিল না। ইতিমধ্যেই প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রের বেশ কিছুটা রপ্ত করে নিতে পেরেছিলেন ডক্টর ম্যারাকট। আমাকে বলেছিলেন, যদি কোনওদিন তাঁর এই জ্ঞান মর্তের মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলে নির্ঘাৎ বিপ্লব এসে যাবে বিজ্ঞান জগতে। অন্য অনেক জ্ঞানের মধ্যে আটলান্টিয়ানরা পরমাণু ভাঙবার কৌশল আবিষ্কার করেছিল, ফলে যে শক্তি নির্গত হত, তা আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কল্পনার চেয়ে কম পরিমাণ হলেও, সাগরতলের শক্তির আধার ভরাট রেখে দিতে পারত নিজেদের কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্যে। ইথার-এর প্রকৃতি আর শক্তি সম্বন্ধে এদের জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। সবার ওপরে রয়েছে, চিন্তাকে ছবির মতো ফুটিয়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা। এই চিন্তা-সিনেমা দিয়েই তো ওদের দেখাতে পেরেছি আমাদের দুর্দৈব, তারা দেখাতে পেরেছে তাদের অতীতের গৌরব আর পতন কাহিনি। এ সবই তো ইথারের বুকে জেগে থাকা ছাপ-কে বস্তুর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার বিদ্যা।

এতদ্‌সত্ত্বেও, আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক কিছুই এদের অতীত জ্ঞানবৃদ্ধদের নজরের বাইরে থেকে গেছে।

হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছে বিল স্ক্যানলান। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে দেখছিলাম চাপা উত্তেজনায় ছটফটিয়ে যাচ্ছে। যেন বিপুল এক গুপ্ত সংবাদকে গোপনে রাখতে গিয়ে পেট

ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছে। খুক খুক করে আপন মনে হেসেই যাচ্ছে নিজের ভাবনাচিন্তাতেই। এই সময়ে ওকে দেখেছি, বারব্রিক্স নামের এক আটলান্টিয়ানের সঙ্গে গলায় গলায় বন্ধুত্ব পাতিয়ে অষ্টপ্রহর তাকে নিয়ে থাকতে। বেশ কিছু কলকবজা দেখাশুনা করবার দায়িত্বে ছিল বারব্রিক্স। কথাবার্তার বেশির ভাগটাই চালাত হাবেভাবে নয়তো পরস্পরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে। হরিহর আত্মা দুই বন্ধু বেশির ভাগ সময়টা কাটাতে একসঙ্গে। একদিন প্রোজ্জ্বল মুখে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল স্ক্যানলান।

বললে ম্যারাকট-কে, 'ডক, এদের পিলে চমকে দিতে চাই আমার কিছু বিদ্যে দিয়ে। আমাদের পিলে চমকে দিয়েছে বেশ কয়েকবার। এবার চমকে দেওয়ার পালা আমার। আগামীকাল একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যাক।'

আমি বলেছিলাম, 'সেই প্রদর্শনীতে এবার নিশ্চয় হবে জ্যাজ বাজনা?'

'দূর মশায়। ধৈর্য ধরুন, দেখতে পাবেন। আক্কেল গুড়ুম করে ছাড়ব। এখন কিছু বলব না।'

পরের দিন আটলান্টিয়ানরা জড়ো হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে। মঞ্চে উঠে গেছিল স্ক্যানলান আর বারব্রিক্স। চোখমুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিশ্বজয় করতে যাচ্ছে। একজন টিপে দিল একটা বোতাম। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেছিল গমগমে কণ্ঠস্বরের ঘোষণা :

'লন্ডন থেকে বলছি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে। আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী।' তারপরেই যথারীতি আসন্ন প্রাকৃতিক নিম্নচাপের সংবাদ আর বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত সমাচার। তার পর— 'নিউজ বুলেটিন। হ্যামারস্মিথে নতুন এক শিশু হাসপাতাল উদ্বোধন করেছেন মহারাজ' এইভাবেই একনাগাড়ে সংবাদ বিতরণ চলল বেশ কিছুক্ষণ। জলে নেমে আসার পর সেই প্রথম আধুনিক ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় ফিরে গেলাম বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। শুনলাম যুদ্ধকালীন ধারদেনা করার সংবাদ। ক্রীড়া সংবাদ। বিদেশ বার্তা। পুরোনো পৃথিবী সজীব হয়ে গেল কালের গোড়ায়। চক্ষু ছানাবড়া করে সব শুনে গেলেও মানে বুঝল না পাতালবাসী আটলান্টিয়ানরা। তারপর যখন বেজে উঠল যুদ্ধের রণদামামা, তখন উল্লসিত হতে দেখা গেল সাগরতলের বাসিন্দাদের। সঙ্গীত এমনই জিনিস— সবাইকে মাতিয়ে দেয়, বিশেষ করে ব্যান্ড মিউজিক। মেতে উঠে নেচে নেচে অনেকেই ছুটে গেছিল মঞ্চের ওপর, পর্দা সরিয়ে দেখতে চেয়েছিল পেছনে বসে কারা বাজাচ্ছে এমন বাজনা। কিছুই দেখতে পায়নি। ফলে থ হয়ে গেছিল পাতালের প্রতিটি বাসিন্দা।

পরে বলেছিল স্ক্যানলান, ‘রেডিয়ো তৈরির বিদ্যেটা একটু জানা ছিল বলেই ভড়কি দেখালাম। দেখলাম ইথার তরঙ্গ শুধু আকাশের মধ্যে দিয়েই যায় না, জলের মধ্যে দিয়েও যায়। সহজ কেরামতি, কিন্তু বিপুল চমক!’

আটলান্টিয়ানরাও তো কম যায় না। জলের তলায় থেকেও আবিষ্কার করেছিল অনেক কিছু। রসায়নবিদরা মাথা খাটিয়ে বানিয়েছিল এমনই একটা গ্যাস যা হাইড্রোজেনের চেয়ে ন-গুন বেশি হালকা। ম্যারাকট বিশেষ এই গ্যাসটার নাম দিয়েছিলেন “লেভিজেন”। এই গ্যাস নিয়ে উনি নিজেও বেশ কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। সেই সব থেকেই মাথায় এসেছিল খাসা একটা আইডিয়া: লেভিজেন গ্যাস দিয়ে ঠাসা কাচের গোলক পাঠিয়ে দেওয়া যাক সমুদ্রতল থেকে। সমুদ্রপৃষ্ঠে নিয়ে যাক আমাদের বার্তা— সমুদ্রের তলায় কাটাচ্ছি কী ধরনের খাসা জীবন।

‘ম্যান্ডা-কে দিয়েছি মতলবটা,’ আমাদের বলেছিলেন ম্যারাকট, ‘সিলিকা কারখানার কর্মচারীদের বলে দিয়েছে, দিন দুয়েকের মধ্যে গোলক তৈরি হয়ে যাবে।’

আমি বলেছিলাম, ‘কিন্তু আমাদের খবর কাচের গোলকের মধ্যে ঢোকানো হবে কীভাবে?’

‘গ্যাস ঢোকানো হবে ছোট্ট একটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে। সেই ফুটো দিয়েই গলিয়ে দেব কাগজ। তারপর ঝানু কারিগররা বন্ধ করে দেবে ফুটো। ছেড়ে দিলে নিশ্চয় জল ঠেলে উঠে যাবে ওপরে।’

‘তারপর নেচে নেচে বেড়াবে ঢেউয়ের ওপর বছরের পর বছর?’

‘সেটা ঘটলেও ঘটতে পারে। তবে, গোলক থেকে রোদ ঠিকরে যাবে। লোকের চোখে পড়বেই। গোলক ছাড়ব ইউরোপ আর দক্ষিণ আমেরিকার মাঝামাঝি জায়গার সাগরের তলা থেকে যেখানে রয়েছি আমরা। অনেক জাহাজ যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। কারও না-কারও চোখে পড়বেই।’

ভায়া ট্যালবট; এই চিঠি সেইভাবেই পৌঁছচ্ছে তোমার কাছে, অথবা অন্য কোনও জনের হাতে। তবে আরও একটা আইডিয়া খেলে গেছিল আমাদের আমেরিকান দোস্ত বিল স্ক্যানলান-এর মগজে।

বলেছিল, ‘শুধু পত্র পাঠিয়ে কী লাভ? যেতে হবে নিজেদের।’

‘কীভাবে?’ জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

‘ঠিক যেভাবে চিঠি যাবে ওপরে, সেই ভাবে।’

‘তার মানে?’

‘আরে মশায়, গ্যাস যদি চিঠি বয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমাদেরকে নিয়ে যাবে না কেন?’

‘তারপর পড়ব হাঙরের মুখে?’

‘যাচ্চলে? জল ফুঁড়ে উঠে গিয়ে আমরা তো ছিটকে যাব জল থেকে কমসে-কম পঞ্চাশ ফুট ওপরে। তা-ই দেখে ভড়কে যাবে সব্বাই!’

‘তারপর?’

‘আরে গেল যা! তারপরের কথা তারপরে! আগে তো ওঠা যাক ওপরে। ঘরে আমার একটা বউ আছে।’

সায় দিয়েছিলেন ম্যারাকট সোল্লাসে, ‘আমিও চাই জগতের বিজ্ঞানীদের মুন্ডুগুলো ঘুরিয়ে দিতে। ম্যান্ডা-র সঙ্গে দোস্তি আমার ভালোই। দেখা যাক কী করা যায়।’

মতলবটায় কেন আমার মত ছিল না, সে কাহিনি বলছি পরে।

বলেছিলাম, ‘নিছক পাগলামি। জল ঠেলে উঠে পটল তুলবে খিদে আর তেষ্টায়।’

ম্যারাকট বলেছিলেন, ‘কী আশ্চর্য! বিশেষ অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমা মেপে উঠে গেলেই জাহাজ যাতায়াতের পথে গিয়ে পড়ব।’

স্ক্যানলান বলেছিল, ‘যাচ্চলে! নিজেরা না গেলেই হল। শুধু খবর পাঠানো যাক— আমরা রয়েছি অমুক অক্ষাংশ অমুক দ্রাঘিমায়। জাহাজ থেকে রশি নামিয়ে তুলে নিয়ে যাবে আমাদের।’

ম্যারাকট আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ‘শুধু আমরা তিনজন কেন, একজন সুকন্যাও যেতে পারে আমাদের সঙ্গে।’

সোল্লাসে বলেছিল স্ক্যানলান, ‘তা-ই হোক, তা-ই হোক। মিস্টার হেডলে, লিখুন চিঠি, ছ-মাসের মধ্যে পৌঁছে যাব লন্ডনের নদীতে।’

তাই ছাড়লাম দু-খানা কাচের গোলক। ছোট্ট বেলুন।

বিদায়।

*

কাচের গোলকের ভেতরকার বিবরণীর সমাপ্তি এইখানেই।

খবরটা হু-হু করে ছড়িয়ে গেছিল গোটা ইউরোপ আমেরিকায়। একটা জাহাজ এসে গেছিল নির্দিষ্ট দ্রাঘিমা অক্ষাংশের জায়গায়। পিয়ানোর তারে বাঁধা একটা বোতলের মধ্যে (সিসে দিয়ে ভারি করা) ছিল এই বার্তা :

'আপনাদের সংবাদ নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা বিশ্বকে। আমরা এসে গেছি। একই খবর পাঠাচ্ছি বেতার প্রেরক যন্ত্র দিয়ে। চিরুনি আঁচড়ানোর মতো যাব আপনাদের অঞ্চল বরাবর। এই খবর পিয়ানোর তার থেকে খুলে নিয়ে আপনাদের খবর বেঁধে দিন। যে রকমভাবে বলবেন, সেই রকমভাবে আপনাদের তুলে আনব।'
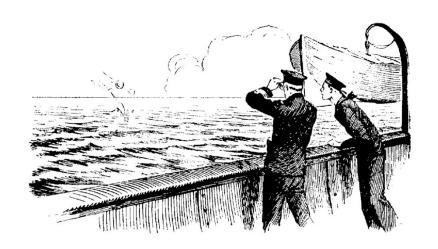
এই বার্তা সাগরের তলায় নামিয়ে দিয়েছিল যে জাহাজ, সেই জাহাজই একই জায়গা দিয়ে যাতায়াত করেছিল পুরো দুটো দিন দুটো রাত। তৃতীয় দিনে ঝকঝকে একটা গোলক ঠিকরে উঠে এসেছিল জলপৃষ্ঠের ওপরে। ভাসছিল জাহাজ থেকে কয়েকশো গজ দূরে। সেই গোলক তুলে এনে অতি কষ্টে ভেঙে ফেলার পর পাওয়া গেছিল এই বার্তা :

'ধন্যবাদ বন্ধুগণ। আপনাদের চমকপ্রদ দেশভক্তি আর এনার্জির জন্যে তারিফ জানাচ্ছি। আপনাদের বেতার বার্তা পেয়েছি। জবাব পাঠাচ্ছি এইভাবে। আগামীকাল, মঙ্গলবার, পাঁচ জুলাই সকাল ছ-টায় তৈরি থাকবেন। ম্যারাকট, হেডলে, স্ক্যানলান।'

এর পরবর্তী বিবরণী দিয়ে গেছেন মিস্টার কে. অসবর্ণ এইভাবে :

'বেশ মিষ্টি সকাল। নীলকান্ত মণির মতো গাঢ় নীল সমুদ্র। দীঘির মতো স্থির, নিস্তরঙ্গ। মাথার ওপর ঘন নীল আকাশের খিলেন। ছোট ছোট মেঘ। 'ম্যারিয়ন' জাহাজের সব্বাই

সজাগ, আগ্রহপ্রদীপ্ত। ঘড়িতে ছ-টা বাজতে বেশি দেরি নেই। সামনের দিকে যাকে দাঁড়িয়ে থেকে চারদিকে খর-নজর রাখতে বলেছিলাম, সে চেঁচিয়ে উঠল ছ-টা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি। আঙুল তুলে দেখাল সমুদ্রের দিকে। ডেকের কিনারায় রেলিংয়ের ধারে জড়ো হলাম সবাই। একটা বোট নামিয়ে নিজে গিয়ে তাতে বসলাম। যেখান থেকে আরও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। স্থির জলের মধ্যে দিয়ে রুপো দিয়ে গড়া বুদবুদের মতো একটা জিনিস দ্রুত উঠে আসছে জলপৃষ্ঠের দিকে। উঠে গেল শূন্যে জাহাজ থেকে প্রায় দু-শো গজ তফাতে। সোজা আকাশের দিকে। খুব সুন্দর চকচকে বর্তুল। ব্যাস ফুট তিনেক। খেলনার গ্যাসভরতি বেলুনের মতো ভেসে গেল হাওয়ার টানে। দেখে মোহিত হওয়ার মতো দৃশ্য। কিন্তু আমি ভয় পেলাম। বর্ম কি ছিঁড়ে গিয়ে ছিটকে গেল? যাদেরকে টেনে তোলার কথা, তারা তলিয়ে গেল? বেতার বার্তা পাঠালাম তৎক্ষণাৎ :

"'আপনাদের বার্তাবাহক এসেছিল জাহাজের খুব কাছে। সঙ্গে কিছু লাগানো ছিল না। হাওয়ায় উড়ে গেল।' নামিয়ে দিলাম আরও একটা বোট— যদি দরকার হয়।

'ছ-টার ঠিক পরে ওয়াচম্যানের কাছ থেকে এল আর একটা সিগন্যাল, তারপরেই দেখলাম আবার একটা রুপোলি বর্তুল, প্রথমটার চাইতে ধীর গতিতে উঠে আসছে জলের মধ্যে দিয়ে। উঠে এসে ভাসতে লাগল বাতাসে, কিন্তু তাতে বাঁধা বোঝাটা রইল জলপৃষ্ঠে। সেই বান্ডিলের মধ্যে দেখা গেল মাছের চামড়া দিয়ে মোড়া প্রচুর বই, কাগজ আর রকমারি বস্তু। টেনে তোলা হল জাহাজের ডেকে। বেতার বার্তা মারফত জানিয়ে দেওয়া হল কী কী পেয়েছি। সাগ্রহ প্রতীক্ষা শুরু হল তারপর থেকে।
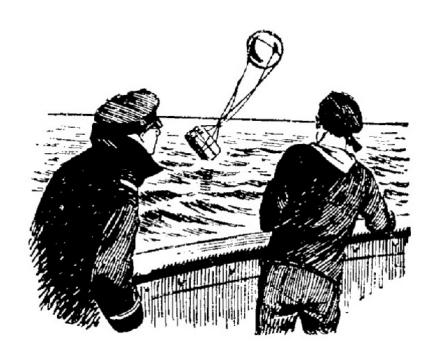
‘এবার আর বেশি দেরি হল না। আবার জল ঠেলে তেড়ে উঠে এল একটা রুপোলি বুদবুদ। এবার কিন্তু জলপৃষ্ঠ ছেড়ে বেশ খানিকটা শূন্যে উঠে গিয়ে ভাসতে লাগল চকচকে সেই বুদবুদ, সবিস্ময়ে দেখলাম, তাতে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে ছিপছিপে চেহারার নারী মূর্তি। তেড়ে উঠে আসার দরুন জলপৃষ্ঠ ছেড়ে খানিকটা উঠে গেলেও ফের জল পৃষ্ঠেই নেমে এসে ভাসতে লাগল। টেনে আনা হল তক্ষুনি। বর্তুলের ওপর দিকে বাঁধা একটা চামড়ার বেল্ট থেকে চামড়ার ফিতে নেমে এসে আটকে রয়েছে সেই তন্বী রমণীর ক্ষীণ কটিদেশের চওড়া বেল্টে। তার শরীরের ঊর্ধ্বাংশ মোড়া রয়েছে নারকেল আকারের অদ্ভুত স্বচ্ছ একটা খোলস দিয়ে। জিনিসটাকে বলা যাক কাচের খোলস, কিন্তু কাচের চেয়ে মজবুত হালকা সেই পদার্থ যা দিয়ে নির্মিত হয়েছে অর্ধস্বচ্ছ কাচের মতো গোলক।

‘প্রায় স্বচ্ছ এই গোলকের গায়ে রয়েছে রুপোলি শিরা আর ধমনীর মতো আঁকাবাঁকা রেখার জটাজাল। অদ্ভুত কাচের এই খোলস খুবই টাইটভাবে লাগানো রয়েছে ঘাড়ে আর কোমরে ইলাসটিক বেল্ট দিয়ে যা এক্কেবারে ওয়াটারটাইট— এক বিন্দু জল ঢাকবারও উপায় নেই। ভেতরে রয়েছে বাতাস তৈরির কেমিক্যাল কলকবজা যার বর্ণনা হেডলে-র মূল পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছিল। অনেক কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাসের বেল্ট খুলে এনে তন্বী মহিলাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল ডেকের ওপর। পড়ে রইল সুগভীর জ্ঞানহীন অবস্থায়। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মিত ছন্দ থেকে বোঝা গেল, জ্ঞান ফিরে আসবে এখুনি। জলচাপের

মধ্যে দিয়ে বেগে এতটা উঠে আসার ধকল যাচ্ছে শরীর আর স্নায়ুতন্ত্রের ওপর দিয়ে। বাতাসের যা চাপ, জল চাপ তো তার থেকে বেশি। এহেন অবস্থায় মানিয়ে নেয় ডুবরিরা। কোনও মহিলার পক্ষে সে অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ নয়।
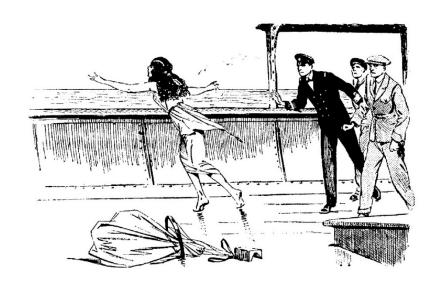
'নিঃসন্দেহে এই সেই আটলান্টিয়ান সুকন্যা, নাম যার মোনা, যার কথা হেডলে জানিয়েছে আগেই। জলতলের সেই কন্যা মর্তলোকের বাতাসে কিঞ্চিৎ কাহিল তো হবেই। তার গায়ের রং গাঢ়, গঠন নিখুঁত সুন্দর, সম্ভ্রান্ত আকৃতি, মাথার কালো চুল বেশ লম্বা। ক্ষণপরেই যে প্রবালনীল চোখ মেলে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে ছিল আশপাশে মুগ্ধ বিস্ময়ে। ঝিনুক আর মুক্তো দিয়ে তৈরি তার ক্রিম রঙের পরিচ্ছদ। অতল জলের এমন রূপসী কন্যাকে কেউ কখনও কল্পনাতেও আনতে পারেনি। আশ্চর্য সুন্দর দুই চোখে সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে এসেছিল একটু একটু করে। আচমকা লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে জাহাজের রেলিংয়ের কাছে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল কান্না-কান্না গলায়— 'সাইরাস! সাইরাস!'

'জলতলের বাসিন্দাদের উদ্বেগ কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে বেতার বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আগেই। কিন্তু এখন তাদের তিনজনে পর পর উঠে এল জল ভেদ করে, ছিটকে গেল জলপৃষ্ঠ থেকে তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঁচুতে, তারপরেই ঝপাস করে পড়ে গেল সাগরের জলে। আমরা জাহাজের ডেকে তাদের তুলে আনলাম ঝটপট। জ্ঞান ছিল না তিনজনেরই। রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে বেরোচ্ছিল স্ক্যানলানের নাক আর কান থেকে। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনজনেই টলে টলে হেঁটে গেছে ডেকের ওপর দিয়ে। এক-একজন দেখিয়েছিল এক-এক

রকম প্রতিক্রিয়া। হাস্যমুখর নাবিকেরা স্ক্যানলানকে টেনে নিয়ে গেছিল মদের আড্ডায়, সেখান থেকে ভেসে আসছিল ফুর্তির ফোয়ারা ছোটানো হল্লাবাজি। ডক্টর ম্যারাকট খপ করে তুলে নিয়েছিলেন কাগজপত্রের বান্ডিল, যার মধ্যে বীজগণিতের অঙ্ক আর চিহ্ন ছাড়া ছিল না কিছুই, দৌড়ে নেমে গেছিলেন নিচের তলায় সিঁড়ি বেয়ে। সাইরাস হেডলে ছিটকে গেছিল অদ্ভুত কন্যার পাশে। যেন এমন মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে রাজি নয় মোটেই। ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি এইখানেই। ওয়ান্ডারফুল অ্যাডভেঞ্চারের বিশদ বিবরণ পরে যাবে সম্ভবত অ্যাডভেঞ্চারিস্টদের কাছ থেকেই।’

অনেকেই পত্র পাঠিয়েছিলেন আমাকে, ডক্টর ম্যারাকটকে, এমনকী বিল স্ক্যানলানকেও। আটলান্টিকের তলদেশে আমাদের অত্যাশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার সাড়া জাগিয়েছিল দেশে দেশে। জায়গাটা উত্তর আটলান্টিকের ক্যানারিজ দ্বীপপুঞ্জ থেকে ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। সাবমেরিন পন্থায় জলতলে নেমে গিয়ে যা যা দেখে এসেছি, যে সব আমাদের জলতল সম্বন্ধে পূর্বধারণা পালটে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। 'নিতল জলের' জীবনধারা সম্বন্ধে যে ধারণা তা উল্টে দিয়ে গেছে আমাদের সেই অ্যাডভেঞ্চার। একই সঙ্গে প্রমাণ জুগিয়ে গেছে একটা অতি আশ্চর্য ব্যাপারের— অতীব অবিশ্বাস্য কষ্টকর পরিবেশের মধ্যে যেখানে টিকে রয়েছে এক সুপ্রাচীন সভ্যতা। অভিজ্ঞতার আরও বিশদ বিবরণ দেওয়ার জন্যে চিঠি এসেছে বিস্তর। প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা বিবরণী ছিল ভাসা ভাসা, যদিও ছুঁয়ে গেছিলাম মূল ঘটনাগুলোর সব ক-টাকে। কিছু ঘটনা বর্ণনায় সংযত ছিলাম, বিশেষ করে কিছুই বলিনি কৃষ্ণবদন মহাপ্রভুর ভয়ানক উপসংহার সংক্রান্ত ঘটনাবলী। এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন কিছু একেবারেই অসাধারণ প্রকৃতির সিদ্ধান্ত, যা চেপে যাওয়াই সঙ্গত মনে করেছিলাম তখনকার মতো। এখন যখন বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে আমাদের সিদ্ধান্ত— বলতে পারি, সমাজও মেনে নিয়েছে আমার বধূকে— তখন আমাদের মোটামুটি সত্যবাদিতা সম্বন্ধে আর কোনও সংশয় থাকতে পারে না; কাজেই এখন আরও কিছু বলা যেতে পারে, যা জানামাত্র জনগণের সহানুভূতি বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিলক্ষণ। ভয়ানক বিস্ময়কর সেই ঘটনাবলী বলার আগে বলে নিতে চাই আটলান্টিয়ানদের জলতল সমাধিস্থ নিবাসে আমাদের মাসকয়েক থাকা প্রসঙ্গে আমার আরও কিছু ওয়ান্ডারফুল অভিজ্ঞতা বিবরণী— সেইসব আটলান্টিয়ান সম্বন্ধে যারা কাচের শোকেসবন্দি অক্সিজেন সরবরাহ নিয়ে অক্লেশে ঘুরে বেড়ায় সাগরতলে— ঠিক যে ভাবে দেখতে পাচ্ছি আমার এই হাইড পার্ক হোটেল থেকে লন্ডন বাসিন্দাদের ঘুরে বেড়ানো ফুলঝোপের আশপাশ দিয়ে।

জলপৃষ্ঠ থেকে জলতলে জঘন্য পতনের পর সাগরতলের এই মানুষরা প্রথম-প্রথম আমাদেরকে অতিথি হিসেবে না দেখে বন্দি হিসেবেই দেখে গেছিল। এহেন পরিস্থিতি পালটে গেল কীভাবে, এবার তা বলা যেতে পারে। ডক্টর ম্যারাকটের প্রতিভার চমক তাদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার ফলেই যে এমনটা ঘটেছে, তা কি আর খুলে বলতে হবে?

উনি একাই ওদের মনে এমন একটা ছাপ ফেলে এসেছেন যার দৌলতে আমরা যেন স্বর্গলোক থেকে নেমে আসা অতিথিবৃন্দের পর্যায়ে পৌঁছে গেছিলাম। তারপর ফিরে গেছি সেই স্বর্গলোকেই তাদেরই ঘরের এক কন্যাকে নিয়ে বধূ হিসেবে।

আশ্চর্য সেই দুনিয়ার আরও কিছু অদ্ভুত বৃত্তান্ত এবার লিপিবদ্ধ করা যাক। সেই সঙ্গে লিখে রাখি বেশ কিছু অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি— যা ঘটে গেছিল চূড়ান্ত অ্যাডভেঞ্চারটার আগে — যে অ্যাডভেঞ্চার দাগ রেখে যাবে আমাদের মনের মধ্যে আমৃত্যু— কৃষ্ণবদন মহাপ্রভুর আবির্ভাব নিয়ে সেই প্রসঙ্গ লিখতে গিয়েও যে আমার কলম কেঁপে ওঠে বারবার! এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ভাবনা এসে যায় মনের মধ্যে, আরও কিছুদিন থেকে গেলেই পারতাম সাগরতলে। সেখানকার বহুবিধ রহস্যের আকর্ষণে আজও যখন অনেক প্রহেলিকার মর্ম বুঝে উঠিনি, তখন আরও কিছুদিন থাকা উচিত ছিল আমাদের। ওদের ভাষাটাও শিখে নিচ্ছিলাম ঝটপট, সেক্ষেত্রে পেতাম আরও অনেক তথ্য।
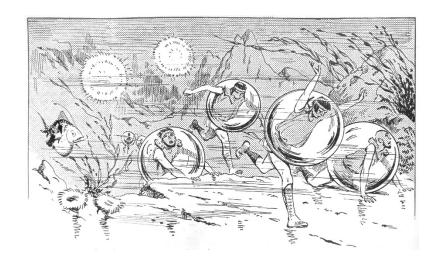
অভিজ্ঞতা এই সব সাগরতলের মানুষদের শিক্ষা দিয়ে গেছে নানান দিক দিয়ে— শিখেছে অনেক ভয়ানক কাণ্ডকারখানার ইতিবৃত্ত; দেখেছে অনেক নিরীহ ব্যাপারস্যাপার। মনে পড়ছে একদিনের ঘটনা। আচমকা বিপদ সংকেতের ঘণ্টা বেজে উঠতেই আমরা সকলে অক্সিজেন মোড়কে নিজেদের মুড়ে নিয়ে ছুটে গেছিলাম সাগরের তলদেশের প্রান্তরে। কিন্তু কেন যে ছুটছি, কী যে ঘটেছে, তা থেকে গেছে রহস্যাবৃত। তবে নিঃসীম আতঙ্ক ফুটে উঠতে দেখেছিলাম প্রত্যেকেরই চোখে মুখে। প্রান্তরে পৌঁছে দেখেছিলাম বেশ কিছু গ্রিক কয়লাখনি শ্রমিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে কলোনির প্রবেশ পথ লক্ষ করে। দৌড়ে আসার ফলে নিদারুণ ক্লান্তিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল কর্দমপঙ্কের মধ্যে বারংবার— আমরা যে তাদের বাঁচানোর জন্যেই ছুটে যাচ্ছি, তাও বোঝা হয়ে গেছিল। সেই মুহূর্তে আগুয়ান আতঙ্কের মোকাবিলা করার জন্যে কারও কাছে কিন্তু কোনও হাতিয়ার দেখিনি, রুখে দাঁড়ানোর মতো মনোভাব দেখিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই কয়লা শ্রমিকদের যারা আর হাঁটতে যেন পারছিল না— টেনেটুনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল আশ্রয়স্থলে দরজার মধ্যে দিয়ে। তারপর তাকিয়ে দেখেছিল যেদিক থেকে তারা হোঁচট খেতে খেতে এসেছে, সেইদিকে। দেখতে পেয়েছিলাম শুধু সবজেটে কুয়াশার মতো মেঘপুঞ্জ, যার কেন্দ্র বিলক্ষণ আলোকময়, কিনারার দিকটা খোঁচা খোঁচা, আমাদের দিকে আসছে যেন ভেসে ভেসে— নক্ষত্রবেগে নয়। প্রায় আধমাইল দূর থেকেই তাদের আগমনের সুস্পষ্ট সংকেত পেয়ে কয়লাখনি শ্রমিকরা দরজার দিকে ছুটে আসছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে! রহস্যজনক সেই আবিল আতঙ্ককে আরও কাছে চলে আসতে দেখে নার্ভাস হয়ে গেছিল পাম্প চালকরা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নিরাপদে চলে এসেছিলাম সকলে। দেখেছিলাম স্বচ্ছ ক্রিস্টালের মতন মস্ত একটা চাঁই— লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় দু-ফুট দরজার খিলেনের ঠিক ওপরে যেখানকার আলোক ব্যবস্থা দিয়ে জোরালো আলো ফেলা যায় বাইরে। এমনতর দৃশ্য দেখবার জন্যেই সিঁড়ি লাগানো থাকে সেখানে। আমরাও উঠে গেছিলাম সিঁড়ি বেয়ে। সাদামাটা জানলার ভেতর দিয়ে তাকিয়েছিলাম বাইরে। দেখেছিলাম অদ্ভুত আলোকময় সবুজাভ কিছু একটা থমকে গেছে দরজার সামনে। দেখলাম, ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে আমাদের দু-পাশের আটলান্টিয়ানরা। তারপর একটা ছায়াচ্ছন্ন প্রাণী জল ঠেলে এগিয়ে এসে নড়ে নড়ে গেল জানলার সামনে। তৎক্ষণাৎ আমার দু-পাশের আটলান্টিয়ান সঙ্গীরা আমাকে টেনে নামিয়ে এনেছিল জানলার সামনে থেকে। কিন্তু পুরোপুরি নেমে আসার আগেই আমারই অসাবধানতার জন্যে মাথার চুলের খানিকটা থেকে গেছিল জানলার সামনে। জলচর মহা আতঙ্করা সেখানে তাদের ছাপ রেখে গেছে। খানিকটা চুল সাদা হয়ে রয়েছে আজও।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দরজা খুলতে আর সাহস পায়নি আটলান্টিয়ানরা। তারপর অবশ্য একজন দুঃসাহসী দেখে এসেছিল বাইরের অবস্থা। ফিরে আসবার পর তাকে যেন মাথায় তুলে নাচা হয়েছিল, যেন বুকের পাটা আছে বিলক্ষণ। তার মুখেই জানা গেছিল, তল্লাট এখন বিপদমুক্ত। তারপরে সবাই যেন ভুলেই গেল মহা আতঙ্ককে। আমরা খবর নিয়ে জেনেছিলাম, বিপুল এই বিভীষিকার নাম 'প্রাক্সা'। আতঙ্কে কাঠ হয়েছিল প্রত্যেকেই নামটা উচ্চারণ করবার সময়ে। একজনকেই শুধু উল্লসিত হতে দেখেছিলাম। তিনি ডক্টর ম্যারাকট। একটা ছোট জাল আর একটা কাচের ফুলদানি নিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, আটকে রাখা হয়েছিল অতিকষ্টে। সোল্লাসে কিন্তু বলে গেছিলেন একটাই কথা, 'প্রাণের নতুন এক বিকাশ, কিছুটা জৈব, কিছুটা গ্যাসীয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে ধীমান।' স্ক্যানলানের অত বৈজ্ঞানিক হামবড়াই ভাব নেই। সোজা সাপটা বলে দিয়েছিল, 'নরকের দূত।'

দু-দিন পরে চিংড়ি মাছ ধরার অভিযানে বেরিয়েছিলাম। গভীর জলের ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাত জাল দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরছিলাম নমুনা হিসেবে। আচমকা দেখেছিলাম একজন কয়লা-শ্রমিককে। অদ্ভুত জীবটার খপ্পরে পড়েছিল নিশ্চয়। কাচের গোলক চূর্ণ হয়েছে— অথচ এই কাচ-বস্তুটা নিরতিসীম শক্ত পদার্থ দিয়ে তৈরি যা

বুঝেছেন নিশ্চয় আমার পাঠানো প্রথম লিপি উদ্ধারের সময়ে। বেচারার চোখ দুটো খুবলে বের করে নেওয়া হয়েছে, তাছাড়া শরীরের আর কোথাও কোনও ক্ষত নেই।

ফিরে এসে প্রফেসর বলেছিলেন, 'পছন্দসই খাবার খেতে ভালোবাসে। নিউজিল্যান্ডে একরকম শ্যেন কাকাতুয়া আছে। ভেড়া মারে শুধু কিডনি-র ওপরদিকের মাংস খাওয়ার জন্যে। জঘন্য এই প্রাণীটা মানুষ মারে শুধু চোখ খাওয়ার জন্যে। খাইয়ে প্রাণী বলা যায়। স্বর্গে আর পাতালে প্রকৃতির বিধান একটাই— নিরতিসীম নিষ্ঠুরতা।'

ভয়ানক এই কানুনের আরও অনেক নিদর্শন পেয়েছিলাম জলের গভীরে। মনে পড়ছে একটা ব্যাপার। সাগরপঙ্কের বহু জায়গায় দেখেছিলাম অদ্ভুত খাঁজকাটা দাগ। যেন টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটা পিপে। দাগটা দেখিয়েছিলাম আটলান্টিয়ান সঙ্গীদের। জেরা করে অদ্ভুত প্রাণীটা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলাম। নামটা বলতে গিয়ে জিভ দিয়ে অদ্ভুতভাবে ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ করে যা বলেছিল তা ইউরোপীয় জিভে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়— ইউরোপীয় হরফ দিয়েও তা লেখা যায় না। মোটামুটিভাবে বলা যায়, নাম তার ক্রিসচক। চেহারার বর্ণনা দিতে গেলে আটলান্টিয়ান চিন্তা-প্রতিফলকের সাহায্য না নিলেই নয়। মন দিয়ে যা বোঝাতে চেয়েছে, চিন্তার চেহারায় তা ফুটে উঠেছিল। সে এক অদ্ভুত সাগরদানব। প্রফেসর তার শ্রেণীকরণ করেছেন এইভাবে: দানবিক খোলকহীন শামুকবিশেষ। সাইজে বিরাট, আকারে সসেজ অথবা শুঁয়োপোকার মতন, সারা গায়ে খোঁচা খোঁচা কাঁটা। পর্দার বুকে এহেন ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়েও আটলন্টিয়ান সঙ্গীরা ভয়ের চোটে ঘেমে গিয়ে শিউরে উঠেছিল।

ঘামেননি শুধু প্রফেসর ম্যারাকট। বরং উল্লসিত হয়েছিলেন। অজানা এহেন সাগর দানবের শ্রেণী বিচারের জন্যে উদগ্রীব হয়েছিলেন। ফলে, একদিন দেখেছিলাম, কাদার ওপর দিয়ে টানা লম্বা ঘসটানির দাগ দেখে এগোচ্ছেন আগ্নেয় পাথর ঘেরা ঝোপঝাড়ের দিকে, যার মধ্যে নিশ্চয় নিবাস রচনা করে রয়েছে অজানা এই আতঙ্ক। প্রান্তর পেরিয়ে আসবার পরেই সেই দাগ আর না দেখলেও প্রকৃতির তৈরি একটা গলিপথ দেখে বুঝেছিলাম শরীরী আতঙ্ক মহোদয় নির্ঘাৎ নিবাস রচনা করে রয়েছে তার মধ্যে। তিনজনেরই হাতে ছিল সড়কি— যা থাকে সব আটলান্টিয়ানদের হাতে— কিন্তু ওই জিনিস তো খড়কে-কাঠি অজানা ওই আতঙ্কের কাছে। প্রফেসর কিন্তু নাছোড়বান্দা। এগিয়েই চললেন। অগত্যা আমাদেরকেও যেতে হল পেছন পেছন।

পাথুরে গিরিখাত উঠে গেছিল সটান ওপর দিকে, দু-পাশে রাশীকৃত আগ্নেয় আবর্জনা, ছেয়ে গেছে প্রচুর স্তরীভূত কোলেনকাইমা-য়, যা কিনা গভীর সাগরতলের এক বৈশিষ্ট্য। হাজার হাজার বিউটিফুল কলসি গড়নের পাতা, তারামাছ, সমুদ্রশশা, কতই না রং তাদের অঙ্গে অঙ্গে, আকৃতিও রকমারি, উঁকি দিয়ে রয়েছে আবর্জনার মধ্যে থেকে— যে সবের খাঁজে খাঁজে বাসা বেঁধেছে কঠিন খোলস দিয়ে ঢাকা চিংড়ি আর কাঁকড়ার মতো কত রকমের প্রাণী— মৃদুমন্দ গতিবেগে যারা চলমান যেন হামাগুড়ি দিয়ে। গতিবেগ তাই ছিল আমাদের মন্থর, কেননা সাগরতলের এমন জায়গায় হনহন করে হাঁটা যায় না, এ ছাড়া খাড়াই আগ্নেয় পাহাড় বেয়ে উঠতে হচ্ছিল একটু একটু করে। আচমকা দেখেছিলাম সেই জীবটাকে যাকে শিকার করবার জন্যে এসেছি এতটা পথ— দেখে তো গা হিম হয়ে গেছিল আমার।

শরীরী এই আতঙ্ক আগ্নেয় পাথরের শিলাস্তূপ বিবর থেকে অর্ধেক বের করে এনেছিল নিজেকে। লোমশ বপুর প্রায় পাঁচ ফুট বেরিয়ে ছিল বাইরের দিকে। দেখতে পাচ্ছিলাম থালার মতো চাকা চাকা চোখ, হলদেটে রঙের অতি কঠিন মূল্যবান অকীক পাথরের মতন, মন্থর গতিতে নড়ে নড়ে যাচ্ছিল লম্বা লম্বা দাঁড়া-র ওপর ভর দিয়ে আমাদের অগ্রগতির শব্দ শোনবার সঙ্গে সঙ্গে। তারপরেই খুব আস্তে আস্তে নিজেকে টেনে আনতে লাগল কোটরের ভেতর থেকে, শুঁয়োপোকার মতন শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে। কোটরের বাইরে পুরোপুরি বেরিয়ে আসবার পর দেখতে পেয়েছিলাম তার গোটা অবয়ব। সে এসেছিল ফুট চারেক বাইরে আমাদের ভালো করে দেখে নেওয়ার অভিপ্রায়ে, আর তখনই আমি দেখেছিলাম, টেনিস জুতোর ঢেউখেলানো খাঁজ কাটা শুকতলার মতো কী যেন আটকানো রয়েছে তার ঘাড়ের দু-পাশে— একই রঙের, গড়নের খাঁজকাটা। এ জিনিসের মানে কী, তা মাথায় আনতে পারিনি। তবে তার কার্যকারিতার ফলে শিক্ষালাভ করেছিলাম একটু পরেই।
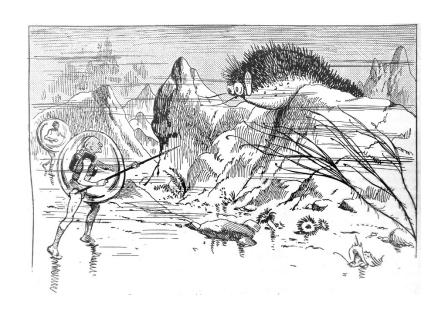
প্রফেসর তাঁর সড়কি উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেছিলেন সামনের দিকে, চোখে মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব। দুর্লভ একটা নমুনা সংগ্রহের সুযোগ পাওয়ায় ভয়টয় একদম নেই মনের মধ্যে। স্ক্যানলান আর আমি অবশ্য অতটা বেপরোয়া হতে পারিনি, বুড়ো মানুষটাকে ফেলে চম্পট দিতেও পারিনি, তাই খাড়া ছিলাম তার দু-পাশে।

বেশ কিছুক্ষণ অপলকে আমাদেরকে ঠাহর করে নেওয়ার পর একটু একটু করে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে আমাদের দিকে আগুয়ান হয়েছিল বিদ্‌ঘুটে সেই প্রাণী। নামছিল একটু একটু করে ঢাল বেয়ে, পাথরটাথরের ফাঁকফোকর দিয়ে, মাঝে মধ্যে দাঁড়ার ডগার চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিল আমরা আছি কোনদিকে এবং কী করছি। আসছিল এতই মন্থর গতি ভঙ্গিমায় যে নিজেদেরকে নিরাপদই মনে করেছিলাম— বিপদ বুঝলেই চটপট পা চালিয়ে সরে পড়তে কতক্ষণ আর লাগবে। শুধু বুঝিনি, রয়েছি খোদ মৃত্যুর আওতার মধ্যে।

নিয়তি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল আমাদের। বিটকেল চেহারার জানোয়ারটা যখন হেলেদুলে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে গেছে আমাদের কাছ থেকে প্রায় ষাট গজ দূরে, তখন একটা গভীর জলের খুবই বড় সাইজের মাছ শৈবালপুঞ্জ অরণ্য থেকে আস্তে আস্তে ভেসে এসেছিল তার সামনে। এসেছে যখন কেন্দ্রবিন্দুতে, আমরা যেখানে আছি আর বিটকেল চেহারার জানোয়ারটা যেখানে আছে— তার মাঝমাঝি জায়গায়, তখন সে আচমকা তেউড়ে গিয়ে উল্টে গেল, মুহূর্তমধ্যে মরে গিয়ে পড়ে রইল সঙ্কীর্ণ গিরিখাতের তলায়। একই

সময়ে আমাদের প্রত্যেকের আপাদমস্তক শিউরে উঠল অসাধারণ অত্যন্ত অস্বস্তিকর ঝনঝনে অনুভূতিতে, হাঁটু দুমড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। বুড়ো ম্যারাকট দুঃসাহসী হতে পারেন, কিন্তু বেকুব নন। চকিতে বুঝে নিলেন, খেল খতম হয়ে যেতে পারে এখুনি। যে প্রাণীটার সামনাসামনি রয়েছি, সে শিকার নিপাত করে বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিক্ষেপ করে। আমাদের হাতের সড়কি মেশিনগানের সামনে অকিঞ্চিৎকর অস্ত্রের মতন। কপাল ভালো যে ভ্রাম্যমান মৎস্য মহাশয় বিদ্যুৎ বহ্নির শিকার হয়ে গিয়ে আমাদের টনক নড়িয়ে দিয়েছে নইলে ব্যাটারির পুরো চার্জ ঠিকরে পড়ত আমাদের ওপর— নিকেশ হতাম তৎক্ষণাৎ। পাগলের মতন হাঁচড় পাঁচড় করে পালিয়েছিলাম দানবিক বৈদ্যুতিক সমুদ্র-কীটের সামনে থেকে।

নিতল জলের আতঙ্ক সমূহদের একটার কথা বললাম এখানে। আর একটার কথা বলা যাক। প্রফেসর তার নাম দিয়েছিলেন হাইড্রোপস ফেরক্স। বিশাল হাঁ। সারি সারি আতঙ্ক জাগানো ক্ষুরধার দাঁত। সাধারণ পরিস্থিতিতে তাকে নিয়ে ভয় নেই। কিন্তু রক্ত ঝরে পড়লেই, তা সে যত কম পরিমাণেই হোক না কেন, ধেয়ে আসবে পলকের মধ্যে। তখন আর তার খপ্পর থেকে নেই পরিত্রাণ। ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে এসে শিকারকে কুচি কুচি করে ফেলে তৎক্ষণাৎ। কয়লাখনির গর্তে দেখেছিলাম এমনি একটা লোমহর্ষক দৃশ্য। একজন শ্রমিকের কপাল খারাপ। কাজ করতে গিয়ে হাত কেটে রক্ত ঝরিয়ে ফেলেছিল। মুহূর্তের মধ্যে, চতুর্দিক থেকে ধেয়ে এসেছিল রক্তলোলুপ মৎস্য বাহিনী। বৃথাই সে হাত পা ছুঁড়েছিল আছড়ে পড়ে গিয়ে, বৃথাই সড়কি আর কোদাল গাঁইতি চালিয়েছিল তার সঙ্গীরা। আমাদের চোখের সামনেই ঝাঁকে ঝাঁকে রক্তখেকো মৎস্য বাহিনী খুবলে খুবলে খেয়ে নিয়েছিল তার শরীরের নিচের দিকের অংশ, অক্সিজেন মোড়কের নিচের দিকে। আস্ত মানুষটাকে দেখলাম একবার, পরের মুহূর্তে দেখলাম দগদগে লালচে মাংস লেগে রয়েছে ধবধবে সাদা হাড়ে। এক মিনিট পরে দেখা গেল, কোমরের নিচের দিকে সাদা হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। খুবলে খুবলে চেঁছে পুঁচে সব মাংস খেয়ে নিয়ে মৎস্য বাহিনী রেখে গেছে একটা মানুষের আধখানা কঙ্কাল।দৃশ্যটা এমনই ভয়াবহ যে গা গুলিয়ে উঠেছিল আমাদের তিনজনেরই। অমন মজবুত বিল স্ক্যানলান, সে তো জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল তাকে।

তবে এমন অনেক দৃশ্য দেখেছি যা ভয়ানক ভয়ংকর নয় সব সময়ে। একটা দৃশ্য গেঁথে গেছে আমার মনের মধ্যে, স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবে না কক্ষনো। অভিযানে বেরোতাম

কখনও আটলান্টিয়ান গাইড নিয়ে, কখনও নিজেরাই। আশ্রয়দাতারা তো জেনে গেছিল, সব সময়ে আমাদের চোখে চোখে রাখার দরকার নেই। প্রান্তরের এক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তিনজনে। চেনা জায়গা। তাই অবাক হয়েছিলাম সে জায়গায় বেশ খানিকটা হালকা হলুদ রঙের বালি দেখে। পড়ে রয়েছে প্রায় আধ একর জায়গা জুড়ে, অথচ ছিল না আগে। অবাক হয়ে যখন দাঁড়িয়ে পড়েছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন ভাবছি নিশ্চয় অতল জলের কোনও চোরা স্রোত এই বালি এনে ফেলেছে এখানে, নয়তো এসেছে ভূকম্পীয় ঢেউয়ের ফলে, এমন সময়ে আমাদের পিলে চমকে দিয়ে গোটা জায়গাটা আস্তে আস্তে শূন্যে ভেসে উঠে নড়তে নড়তে চলে গেছিল আমাদের মাথার ওপর দিকে। জিনিসটা আকারে এতই বড় যে মাথার ওপর দিয়ে চলে যেতে সময় নিয়েছিল এক মিনিট থেকে দু-মিনিট। দানবিক চ্যাপটা মাছ। প্রফেসরের মতে সমুদ্রের ওপর দিকেও চ্যাপটা মাছ দেখা যায়; তবে সাগরের গভীরে এমন অতিকায় হতে পেরেছে পুষ্টিকর আহারের জোগান পেয়ে। আস্তে আস্তে হেলেদুলে রাজকীয় ভঙ্গিমায় ঊর্ধ্বপথে প্রস্থান করেছিল অতিকায় মৎস্য, আমাদের বিমূঢ় অবস্থায় রেখে দিয়ে। আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেছিল সাদা আর হলুদের ঝিকিমিকি রোশনাই।
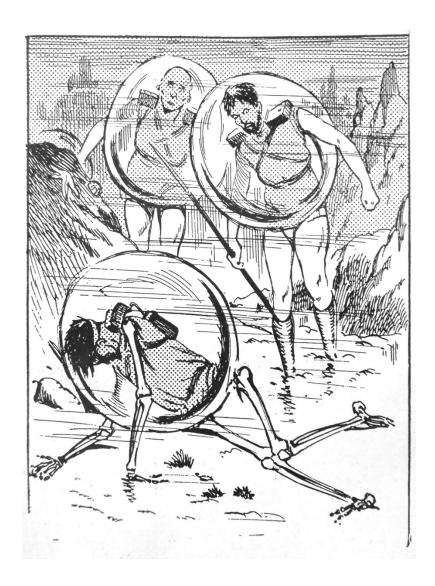
গভীর জলের আর একটা কাণ্ড একেবারেই অপ্রত্যাশিত। টর্নেডো, যা নাকি হামেশা দেখা দেয়। মাঝে মাঝে এদের অভ্যুত্থান ঘটে প্রচন্ড সামুদ্রিক স্রোতের দাপটে, কোনও রকম পূর্বাভাস না দিয়ে, ওলটপালট করে দিয়ে যায় সব কিছু— যেমনটা ঘটে স্থলভূমিতে। অবশ্য প্রকৃতির এহেন ব্যবস্থার ফলে আবর্জনা জমতে পারে না কোথাও, কিন্তু সে জিনিস দেখলে যে হাত-পা ঠান্ডা মেরে যায়।

প্রথম যখন জল টর্নেডোর খপ্পরে পড়েছিলাম, তখন আমার সঙ্গে ছিল ম্যান্ডার মেয়ে মোনা। কলোনি থেকে মাইল খানেক দূরে গেছিলাম হাজারো রঙের শৈবাল পুঞ্জের আস্তানায়। জায়গাটা ছিল মোনা-র অতি প্রিয় উদ্যান। কত রঙের কত রকমের শৈবাল যে সেখানে আছে, তা না দেখলে বোঝানো যাবে না। মোনা যেদিন আমাকে নিয়ে গেছিল

আশ্চর্য সুন্দর এই বাগান দেখাতে, আচমকা হুমড়ি খেয়ে ঝড়টা এসে গেল ঠিক তখুনি। স্রোতের সে কী সাংঘাতিক টান। পাথরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম বলে বেঁচে গেছিলাম। দু-জনে দু-জনকে ধরে না থাকলে স্রোতের টানে ভেসে যেতাম। লক্ষ করেছিলাম, ধেয়ে আসা এই জলস্রোত বিলক্ষণ উষ্ণ, যদিও তা সহ্যের মধ্যে। এ থেকেই বুঝেছিলাম দূরে কোথাও আগ্নেয়গিরির উৎস থেকে ধেয়ে আসছে এমন গরম জল। কাদা ঘুলিয়ে গেছিল প্রবল স্রোত আছড়ে পড়ায়, নিভু নিভু হয়েছিল চারদিকের স্বতঃদীপ্ত প্রভা। পথ চেনা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চারদিকের ঘোলাটে কাদায় দিগভ্রান্ত হয়েছিলাম। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো বুকে চাপ অনুভব করায় বুঝেছিলাম, ফুরিয়ে আসছে অক্সিজেনের ভান্ডার।

মৃত্যু যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, আদিম তাড়না তখন মাথা চাড়া দেয়। ছোটখাটো আবেগ ধামাচাপা পড়ে যায়। সেই মুহূর্তে মোনা-কে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে। ভালোবাসা এমনই জিনিস, বিশ্লেষণ করে বোঝানো যায় না। সেই মুহূর্তে তার প্রবালনীল চোখের ভেতর থেকে কিছু একটা ঠিকরে এসে আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। সে যে আমার কাছে কতখানি, তা হৃদয়ের পাতায় পাতায় লেখা হয়ে গেছিল নিমেষের মধ্যে। মৃত্যু হোক পাশাপাশি, সে মৃত্যু হবে পরম সুখাবহ।

কিন্তু তা তো হবার নয়। কাচের বুদবুদের ভেতর দিয়ে টের পাচ্ছিলাম একটা মৃদু কম্পন। যেন কোথাও একটা ঘণ্টাধ্বনির মৃদু প্রতি কম্পন ভেসে আসছে কাচের বুদবুদের মধ্যে দিয়ে। অর্থ বুঝিনি আমি, বুঝেছিল আমার সঙ্গিনী। আমার হাত খামচে ধরে উঠে দাঁড়িয়ে শুনেছিল কান পেতে। তারপর ঝড় ঠেলে টানতে টানতে নিয়ে গেছিল আমাকে। মরণের সঙ্গে সে এক পাঞ্জা কষা দৌড়। প্রতি মুহূর্তেই টের পাচ্ছিলাম, বৃদ্ধি পাচ্ছে বুকের চাপ, দম আটকে আসতে চাইছে। দেখলাম উদ্বিগ্ন চোখে আমাকে দেখছে মোনা, আমিও প্রাণপণে যেতে চেষ্টা করছি তার হাতের আকর্ষণে। আগুয়ান মরণকে টেক্কা মারার সে এক কল্পানাতীত প্রতিযোগিতা। মোনার মুখ চোখ দেখে বুঝেছিলাম, তার অক্সিজেন ভান্ডারে তেমন ঘাটতি দেখা দেয়নি। যতক্ষণ পেরেছি তার হাতের টানে প্রাণপণে ছুটেছি, তারপর চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেছিল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেছিলাম, শুয়ে আছি আটলান্টিয়ান প্রাসাদের মধ্যে নিজস্ব সোফার ওপর। হলুদবরণ আলখাল্লা পরা বৃদ্ধ পুরুত মশায় দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে, হাতে একটা শিশি, তা থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ বেরোচ্ছে— আমার ঘোর কাটানোর দাওয়াই নিশ্চয়। ম্যারাকট আর স্ক্যানলান চোখে মুখে নিঃসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে ঝুঁকে রয়েছে আমার ওপর। মোনা নতজানু হয়ে বসে সোফার পাশে, মুখের পরতে পরতে আর প্রবালনীল দুই চোখে নিঃসীম উদ্বেগ। যে আমাকে হতচেতন অবস্থায় সমুদ্রতলে রেখে দিয়ে দৌড়ে এসে বাজিয়ে দিয়েছিল প্রবেশ পথের বিপদসূচক ঘণ্টা— যে ঘণ্টা রাখা হয়েছিল এই ধরনের জরুরি অবস্থার জন্যে। লোকজন নিয়ে দৌড়ে ছিল আমার কাছে, সঙ্গে ছিল আমার দুই কমরেড— তারাই আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে আনে প্রায় মৃত্যুশয্যা থেকে। প্রাণটা বাঁচিয়েছে কিন্তু মোনা। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে ছুটে না এলে সাগরতলে আমার মৃত্যু ছিল নির্ঘাৎ!

এখন দৈবজোরে সে এসেছে ঊর্ধ্বজগতে আমার সঙ্গে। না এলেও তার সঙ্গে আমি থেকে যেতাম সাগরের তলায়। কেন যে আমরা পরস্পরকে এত কাছে টেনে নিয়েছিলাম, মোনা-র বাবা ম্যান্ডা তার ব্যাখ্যা জুগিয়ে গেছিল একদিন।

আমাদের প্রেম পর্বে তার মধুর সম্মতি ছিল। আশকারা দেওয়ার হাসি ঠোঁটের কোণে ভাসত। যেন এমনটা ঘটবে, তা তার অজানা ছিল না। একদিন আমাকে নিয়ে গেছিল নিজের ঘরে। আমার সামনে রেখেছিল চিন্তা প্রক্ষেপণের পর্দা। জ্ঞান প্রতিফলনের স্ক্রিন। আমি আর মোনা পাশাপাশি বসে দেখেছিলাম, আটলান্টিয়ানদের ইতিহাস অতীত কাহিনি — আমার আর মোনা-র পূর্বজন্মের কাহিনি।

দেখেছিলাম, সুনীল সমুদ্রে ঠেলে ঢুকে রয়েছে একটা অন্তরীপ। আগে বলা হয়নি, ওদের এই চিন্তা প্রক্ষেপণের পর্দায় রঙিন ছবি দেখা যায়। নিছক সাদা কালো নয়। অন্তরীপের প্রান্তে রয়েছে অদ্ভুত নকশার একটা ইমারত, অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সেই ইমারতের ছাদ লাল রঙের, দেওয়াল সাদা। সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর। বাড়ি ঘিরে রয়েছে তালজাতীয় শাখাহীন বৃক্ষ কুঞ্জ। এই কুঞ্জের মধ্যে একটা তাঁবু পড়েছে। সাদা তাঁবু। চকচকে। এদিকে-সেদিকে ঝিকমিক করছে সান্ত্রীদের হাতিয়ার। বৃক্ষকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল মধ্য বয়সী এক পুরুষ। গায়ে বর্ম। হাতে গোলাকার ঢাল। আর এক হাতে ধরা জিনিসটা তলোয়ার না বল্লম, তা ধরা যাচ্ছে না। একবারই সে মুখ ফিরিয়েছিল পর্দার দিকে। মুখাকৃতি দেখে বুঝেছিলাম, আটলান্টিয়ানদের জাতের মানুষ। যেন, ম্যান্ডা-র যমজ ভাই। তফাৎ এক জায়গায়। ম্যান্ডা-র মুখভাব এমন রুক্ষ কর্কশ চোয়াড়ে নয়। পাশব প্রকৃতির চেহারা। জ্ঞানের অভাবে আসেনি এহেন পাশব প্রকৃতি, এসেছে নিজের স্বভাব থেকে। পাশবিকতা আর মগজের ক্ষমতা যখন সহ অবস্থান করে, তখন বিপজ্জনক হয় না আর কিছুই। তার উঁচু কপাল আর দাড়িওলা মুখের বিদ্রুপের হাসি প্রকৃতই শয়তান প্রতিম। এই যদি হয় ম্যান্ডা-র পূর্ব জন্মের আকৃতি, তাহলে বলতে হবে তার আত্মা, তার মন অনেক নিখাদ হয়ে গেছে এই জন্মে। ম্যান্ডা-র ঘাড় নাড়া সম্মতি দেখে বুঝলাম, সঠিক চিন্তাই করেছি আমি।

সে যখন বাড়ির দিকে এগোচ্ছে, বাড়ি থেকে তখন বেরিয়ে এল এক নারী, তার মুখোমুখি হতে। মেয়েটার পরিচ্ছদ সেকেলে গ্রিক মেয়েদের সাজপোশাকের মতন। গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলানো সাদা বসন। অতি সরল, কিন্তু অতি সুন্দর। এর চাইতে সুন্দর পোশাক মেয়েরা আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। পুরুষ প্রবরের দিকে আগুয়ান থাকার সময়ে তার হাবভাবে দেখলাম নম্রতা, আনুগত্য আর শ্রদ্ধা— যেমনটা থাকে পিতার প্রতি কন্যার। বর্মধারী কিন্তু বর্বরের মতো হাত তুলে প্রহার করতে গেল এমন অনন্যাকে। মারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে একটু সরে যেতেই রোদ ঠিকরে গেল মেয়েটির মুখ থেকে। চিনলাম পলকের মধ্যে। সুন্দরী অশ্রুময়ী সেই কন্যা আমার মোনা।

ঝাপসা ঘোলাটে হয়ে গেল রুপোলি পর্দা। পরমুহূর্তে ফুটে উঠল অন্য এক দৃশ্য। পাথরের একটা গুহা। মনে হল, একটু আগেই যে অন্তরীপ দেখেছি, এই পাথুরে গুহা সেখানেই কোথাও আছে। দেখা যাচ্ছে অদূরে একটা অদ্ভুত গড়নের জলযান— দু-দিকের প্রান্ত ছুঁচোলো। তখন রাত হয়েছে, চাঁদ কিন্তু কিরণ সম্পাত করে যাচ্ছে জলের ওপর। আকাশের নক্ষত্ররা পরিচিত— যাচ্ছিল আটলান্টিকের আকাশে, তা রয়েছে আজও। আস্তে আস্তে খুবই হুঁশিয়ারভাবে কাছে আসছে অদ্ভুতদর্শন তরণী। দাঁড় টানছে দু-জন। সামনের দিকে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবর্ণ আলখাল্লাধারী এক পুরুষ। তীরের কাছাকাছি তরণী আসতেই সে সাগ্রহে তাকাচ্ছে এদিকে-সেদিকে। চাঁদের আলোয় তার মুখ দেখতে পাচ্ছি। মোনা আমার হাত খামচে ধরল সেই মুহূর্তে, অস্ফুট চিৎকার করে উঠল ম্যান্ডা। কেননা, তরণীতে দন্ডায়মান সেই ব্যক্তি স্বয়ং আমি।

হ্যাঁ, আমি, সাইরাস হেডলে, এখন নিবাস নিউইয়র্কে, শিক্ষা অক্সফোর্ডে। আধুনিক শিক্ষা আর সংস্কৃতির ধারক এই আমি এককালে ছিলাম সুদূর অতীতের মহাপরাক্রান্ত আটলান্টিকের বাসিন্দা। বুঝলাম, আশপাশের এত প্রতীক, এত চিহ্ন কেন অস্পষ্ট স্মৃতির দরজা খুলে দিয়েছিল মনের মধ্যে। কেন সবই যেন আগে দেখেছি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কারণটা বুঝিনি। মোনা-কে প্রথমবার দেখেই কেন অত রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম, এবার তা বুঝলাম। বারো হাজার বছর আগেকার স্মৃতি উঠে এসেছিল আমার আত্মার গহন মণিকোঠা থেকে।

তরী এসে ঠেকেছে তীরে। ওপর দিকের ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে চোখ ধাঁধানো এক শ্বেতকায় মূর্তি। আমি দু-হাত সামনে বাড়িয়ে ধরেছি তাকে বাহুমধ্যে টেনে নেওয়ার জন্যে। দ্রুত আলিঙ্গন সমাপ্ত করেই তাকে নিয়ে এলাম তরীর ওপরে। আচমকা হুঁশিয়ার হতে হল সবাইকেই। ক্ষিপ্তের মতো দাঁড়িদের নির্দেশ দিচ্ছি জোরে দাঁড় টানতে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে অনেক পুরুষ। তারা খামচে ধরেছে তরণীর এক পাশ। আমি তাদের বৃথাই মারছি। শূন্যে ঝলসে উঠল একটা কুঠার— ঘ্যাঁচ করে বসে গেল আমার মাথায়। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম রূপসী কন্যার গায়ের ওপর, আমার রক্তে লাল হয়ে গেল তার শ্বেত বসন। দেখলাম, সে আর্ত চিৎকার করছে আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে, আর তার বাবা তার কালো কেশ আকর্ষণ করে

হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার বিগত প্রাণ দেহের নিম্নদেশ থেকে। পর্দার ছবির ইতি এইখানেই।

রুপোলি পর্দায় ফুটে উঠতে দেখলাম আর একটা ছবি। সে এক আশ্চর্য চিত্রমালা। দেখা যাচ্ছে এক মস্ত অট্টালিকার অভ্যন্তর— যে অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাজ্ঞানী আটলান্টিয়ানদের প্রচেষ্টায় শেষের সেদিন আগমনের অনেক আগে। উদ্বাস্তুদের ঠাঁই দেওয়ার জন্যে। যে বাড়ির মধ্যে এই মুহূর্তে রয়েছি আমরা। প্রলয়ের মুহূর্তে দেখলাম লোক গিজগিজ করছে তার মধ্যে। তারপর মোনা-কে দেখলাম আবার, সঙ্গে তার জনক মহাশয়— শেষ মুহূর্তে যার টনক নড়েছে বুঝেছে, প্রাণে বাঁচতে হলে আশ্রয় নিতে হবে এই আশ্চর্য অট্টালিকার অভ্যন্তরে। দেখতে পেলাম, মস্ত হলঘরটা থরথর করে কাঁপছে ঝড়ের খপ্পরে পড়া জাহাজের মতো, ভয়ার্ত মানুষগুলো হয় থাম জাপটে ধরছে, নয়তো মাটিতে ঠিকরে যাচ্ছে। তারপরেই জলতলে হেলে পড়ে তলিয়ে গেল সেই প্রাসাদপুরী। পর্দার বুক থেকে ফের মিলিয়ে গেল ছবি। হাসিমুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে ম্যান্ডা বুঝিয়ে দিল, শেষ হয়ে গেল আটলান্টিক।

হ্যাঁ জীবিত দেহে আমরা সকলেই ছিলাম একটা সময়ে, আমাদের সব্বাই, ম্যান্ডা আর মোনা আর আমি, হয়তো ফের থাকব দূর ভবিষ্যতে, অভিনয় করে যাব জীবন শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা। আমার মৃত্যু হয়েছিল ঊর্ধ্বজগতে, তাই পুনর্জন্ম নিয়েছিলাম ওপরের পৃথিবীতেই। ম্যান্ডা আর মোনা দেহ রেখেছিল সাগরের তলায়, তাই পুনর্জন্ম নিয়েছে সাগরতলে আবার সেই পিতা-কন্যা রূপে। মহাজাগতিক বিধিলিপি চলেছে নিজস্ব কানুনের খাতে। প্রকৃতির মহারহস্য অবগুণ্ঠন তুলে দেখিয়ে দিল সামান্য, আশপাশের মধ্যে নিহিত রয়েছে একই মহাসত্য। ঈশ্বরের বিধান অনুসারে এক একটা জন্ম একই গল্পের এক একটা অধ্যায় ছাড়া কিছুই নয়। অনন্ত কালের পথে পথিক আমরা সক্কলে।

বলা যাক এর পরের ঘটনা :

প্রফেসর আর আমি একদিন বসেছিলাম প্রকাণ্ড একটা কমনরুমে। একটা কোণে প্রফেসর বানিয়ে নিয়েছেন তাঁর ল্যাবরেটরি, আগের দিনে পাওয়া একটা পেটুক মাছের শরীর নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন। আমি আটলান্টিয়ান ব্যাকরণ শেখবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি পাশের টেবিলে। জলতলের এই বাসিন্দাদের গ্রন্থাগারে বইয়ের অভাব নেই। সে সব বইয়ের কাগজ পার্চমেন্ট কাগজের মতো দেখতে হলেও মাছের পটকা থেকে চেপে চেপে

তৈরি। লেখাগুলোও বাঁ দিক থেকে শুরু করে ডানদিকে না গিয়ে, ডানদিক থেকে শুরু করে বাঁদিকে এসেছে উর্দুভাষার মতো। আটলান্টিস মহাদেশের যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটনের অভিপ্রায় নিয়ে পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছিলাম পুরোদমে। হরফ চিনে নিয়েছিলাম। ভাষাও রপ্ত করেছিলাম।
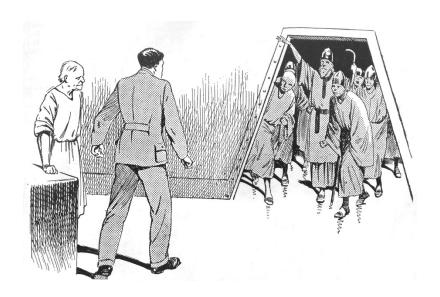
আচম্বিতে বিঘ্নিত হল আমাদের শান্তিময় বিদ্যাচর্চা। অসাধারণ এক শোভাযাত্রা ধেয়ে এল ঘরের মধ্যে। প্রথমে এল বিল স্ক্যানলান, লাল টকটকে মুখ নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায়। এক হাত নাড়ছে শূন্যে, আর এক হাতে বগলদাবা করে রয়েছে কান্নামুখর এক শিশুকে। ওর পেছনেই রয়েছে বারব্রিক্স, এই সেই আটলান্টিয়ান ইঞ্জিনিয়ার ওয়্যারলেস রিসিভার বানাতে যে সাহায্য করেছে স্ক্যানলানকে। এমনিতে সে বিরাটকায় আমুদে প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মুখ মেঘাচ্ছন্ন বিষম শোকে। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে এক স্ত্রীলোক যার খড় রঙের চুল আর আকাশি রঙের চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে জাতে সে আটলান্টিয়ান নয়, নিচু জাতের মানুষ— গোলাম শ্রেণীর প্রাচীন গ্রিকদের বংশধর বলে যাদের নির্ণয় করতে পেরেছি।

তারস্বরে ভীষণ উত্তেজিতভাবে আমেরিকান বুলি মিলিয়ে মিশিয়ে স্ক্যানলান বললে, ‘দেখুন তো কী অন্যায়। বারব্রিক্স বিয়ে করেছে এই মেয়েটাকে। বাচ্চাও হয়েছে। কিন্তু বেজাত বাচ্চা বলে পুরুত ব্যাটাচ্ছেলে এসেছিল সেই তালঢ্যাঙা বিগ্রহটার সামনে বাচ্চা

বলি দেবে বলে। নাকে একখানা ঘুসি ঝেড়ে বাচ্চা ছিনিয়ে এনেছি। শিশুবলি হতে দেব না — কিছুতেই না।

কথা এই পর্যন্ত এগোতেই দড়াম করে ফের খুলে গেছিল দরজা। এবার সদলবলে ঘরে ঢুকেছিল পুরুতমশায় বাচ্চাটাকে স্ক্যানলান-এর কোল থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্যে। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তার রুদ্রমূর্তি দেখে। এক্সপেরিমেন্টের টেবিলে শিশুকে শুইয়ে দিয়ে সে একটা ছুঁচোলো শিক হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে, রক্তগঙ্গা বইয়ে ছাড়বে। তারাও কোমর থেকে ছুরি টেনে হাতে নিয়েছে। কিন্তু স্ক্যানলানের রুদ্র মূর্তি দেখে এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

একজন কিন্তু চুপিসাড়ে এগিয়ে এসেছিল পাশের দিক থেকে। ডক্টর ম্যারাকট যেন শব ব্যবচ্ছেদ করছেন, এমনি একটা মুখভাব নিয়ে টেবিল থেকে একটা মড়াকাটা ছুরি তুলে নিয়ে ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিলেন আগুয়ান হানাদারের ছুরিধরা হাতে। সে যখন যন্ত্রণায়

চেঁচাচ্ছে আর নৃত্য করছে, সঙ্গীরা যখন একযোগে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকেছিল ম্যান্ডা আর মোনা। ম্যান্ডা যখন চড়া গলায় কথা বলছে পুরুত মশায়ের সঙ্গে, মোনা তখন কোনও কথা না বলে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়েছিল নিজের দু-হাতে। ব্যাস, ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটে গেল ওইখানেই। খুনোখুনি আর ঘটল না।

ম্যান্ডা কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকে কী ভেবে নিয়ে পুরুত মশায়কে দলবল সমেত মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে যা বুঝিয়ে গেছিল, আমি তার সবটা বুঝিনি।

বলেছিলাম স্ক্যানলানকে, 'বাচ্চাকে দিতে হবে।'

'দেব না!'

'আরে গেল যা! বাচ্চা দিন মোনা-র জিম্মায়। কাল বসবে পর্ষদের মিটিং।'

'মিস মোনাকে দিতে পারি, কিন্তু ওই পুরুত রাসকেল—' এখানকার প্রথা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে। ওপরের জাত আর নিচের জাতের মধ্যে বিয়ে হলে অসবর্ণ বিয়ের সন্তানকে মন্দিরে বলি দিতেই হবে। এটা কানুন।'

তারপর যা ঘটেছিল, তা-ই নিয়েই শুরু হোক পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চার।

আগেই বলেছি, আটলান্টিয়ানদের জলতলের শহর যেখানে, সেখান থেকে কিছু দূরে রয়েছে তাদেরই সেই মহানগর— যা ছিল একদা ভূপৃষ্ঠে সরগরম অবস্থায়, এখন নেমে এসেছে সমুদ্রতলে বিধ্বস্ত অবস্থায়। এরকমটা হবে তা জেনেই আটলান্টিয়ানরা জলতলে বাসযোগের উপযোগী প্রাসাদ নির্মাণ করে নিয়েছিল। গোটা দেশটা ডুবে গিয়ে প্রাণহীন হয়ে গেলেও প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে চলেছে অতল জলের এই শহর— যেখানে ঠাঁই পেয়েছিলাম আমরা। অক্সিজেন বোঝাই কাচের গোলক দিয়ে মুখ ঢেকে কীভাবে সেই প্রাসাদনগরীর ধ্বংসস্তূপ দেখে এসেছিলাম, সে কাহিনিও আমি বলেছি অনেক আগে। ভাবাবেগে বিচলিত হয়েছিলাম, তাও লিখেছি। ভাষা দিয়ে আমার মনের সেই অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না। দেখে এসেছি জলমগ্ন বিশাল বিশাল ইমারত, কারুকাজ করা থাম সমেত প্রকাণ্ড সৌধ— নিতল জলের স্বতঃদীপ্ত প্রভায় ছায়ামায়ায় গড়া এখন সব কিছুই— খাঁ খাঁ করছে চারিদিক— গভীর জলের মাছ আর বিবিধ প্রাণীদের আনাগোনা চলছে ভেঙে পড়া খিলেন আর বুরুজের আশপাশ দিয়ে। মস্ত তোরণ হেলে ঝুলছে, কোথাও খিলেন ভেঙে পড়েছে... দুঃস্বপ্ন নগরীর মতো ছায়ামায়ায় ঘেরা যেন অতীতের এক কঙ্কাল শহর। আমরা প্রায় টহল দিতে যেতাম জায়গাটায়, কবরখানায় ঘুরে দেখার মতো পায়চারি করতাম, মহাকালের কুলিশকঠোর শাসনের মূর্ত প্রতিচ্ছবি দর্শন করতাম। অদ্ভুত স্থাপত্য নিয়ে হারিয়ে যাওয়া সেই সভ্যতা নিয়ে পৃথিবীর ওপর কতই না জল্পনা কল্পনা... কিন্তু আমাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বলে দিয়েছে, কিংবদন্তী হলেও মূলে আছে সত্যি। আটলান্টিস নামক গৌরবোজ্জ্বল মহাদেশ একদা ছিল ধরাপৃষ্ঠে, এখন তা রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের পাঁচ মাইল তলায়। যেতাম অত্যাবশ্যক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে। জড়বস্তু তথা ভৌতিক পদার্থের মাল-মশলা থেকে যা পাওয়া যায়। কিন্তু এহেন অভিযানের ফলে অচিরেই যে অবাস্তব আধ্যাত্মিক শক্তির আধিভৌতিক নমুনা দেখতে পাব, এমন সম্ভাবনাটা দূরতম কল্পনাতেও আনতে পারিনি। অথচ সেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেল আমাদের— যা লিখতে বসে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।
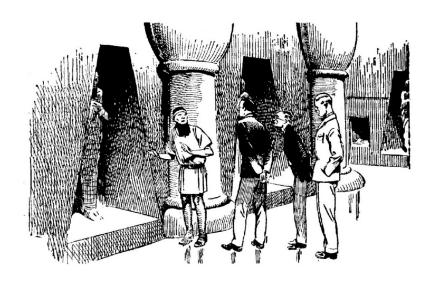
বস্তুজগতে আটলান্টিয়ানরা উর্ধ্বে উঠেছিল। পেছিয়ে থাকেনি আত্মিক কৃষ্টি আর সংস্কৃতিতেও। আধ্যাত্মিক জগতে তাদের সেই উত্থান আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও পতন ঘটেছিল ধীশক্তির অপব্যয় ঘটানোর দরুণ, আত্মিক শাসনে না চলে হঠকরিতা দেখানোর শাস্তি স্বরূপ। সুপ্রাচীন সেই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছিল এ হেন ঔদ্ধত্যের ফলে, হবে আমাদেরও।

প্রাচীন সেই শহরে আমরা দেখেছিলাম বিশাল একটা ইমারত। নিশ্চয় নির্মিত হয়েছিল পাহাড়ের মাথায়, কেননা জলতলে থেকেও রয়েছে সমুদ্রতল থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে, চারদিক ঢালু হয়ে নেমে এসেছে শৈবাল সমাকীর্ণ অবস্থায়। কালো মার্বেল পাথরের রীতিমতো চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে নিচ থেকে ওপরে। এই কালো মার্বেল দিয়ে নির্মিত হয়েছে ইমারতের বেশির ভাগ অংশ। কিন্তু প্রায় ঢেকে এসেছে হলুদ রঙের ভয়াবহ এক ছত্রাকের দাপটে, দগদগে কুষ্ঠরোগের মতো, ঝুলছে প্রতিটি কার্নিশ আর ঠেলে বেরিয়ে থাকা অংশ থেকে। মূল তোরণটাও কালো মার্বেল দিয়ে গড়া। তোরণের মাথায় বসানো কালো পাথরের মেডুসা মুণ্ড— মাথায় কিলবিলে সাপ-চুলের বদলে সে মুখ দেখলেই নাকি পাথর হয়ে যেতে হয়— কিংবদন্তী কাহিনি অনুসারে। গোটা ইমারতের দেওয়ালে দেওয়ালে এখানে সেখানে সেই একই মেডুসা প্রতীক খোদাই করা হয়েছে বারংবার। বেশ কয়েকবার ইচ্ছে হয়েছিল অভিযান চালাব এহেন দুর্লক্ষণযুক্ত অশুভ অট্টালিকার অভ্যন্তরে, প্রতিবারেই কিন্তু আমাদের রুখে দিয়েছিল ম্যান্ডা। বিলক্ষণ অঙ্গভঙ্গীসহ বুঝিয়ে দিয়েছিল— খবরদার! ওই বাড়ির ছায়া যেন না মাড়াই। বেশ বুঝেছিলাম, ম্যান্ডা সঙ্গে থাকলে কোনওদিনই অশুভ

ওই অট্টালিকার অন্দরে প্রবেশ করা যাবে না। অথচ ভেতরে এমন কী আছে যা সিঁটিয়ে দিচ্ছে খোদ দলপতিকে, তা তো জানা দরকার। রহস্য ভেদ করতেই হবে, যে ভাবেই হোক। একদিন সকালে তাই মিটিং করে নিলাম আমি আর স্ক্যানলান।

স্ক্যানলান বলেছিল, ‘কিছু একটা আছে বাড়ির ভেতরে। ম্যান্ডা তা দেখাতে চায় না আমাদের। চলুন, একদিন আপনি আর আমি কাচের গোলক মাথায় দিয়ে ঢুঁ মেরে আসি ভেতরে।’

‘আমার আপত্তি নেই,’ কথা শেষ হতে না হতেই ম্যারাকট ঢুকেছিলেন ঘরে। তাকেও বলেছিলাম, ‘চলুন, কালো মার্বেল প্রাসাদের রহস্যভেদ করে আসা যাক।’

ম্যারাকট বলেছিলেন, ‘ও প্রাসাদ ব্ল্যাক ম্যাজিক-এর প্রাসাদ হলেও হতে পারে। কৃষ্ণ আনন অধিপতির নাম জানা আছে?’

স্বীকার করেছিলাম আমার অজ্ঞতা। একটা কথা লিখতে ভুলে গেছিলাম ডক্টর ম্যারাকট সম্বন্ধে। উনি তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে জগৎবিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। সুপ্রাচীন আদিম বিশ্বাস নিয়ে গবেষণা করে বিলক্ষণ নাম কিনেছেন। আটলান্টিস সম্বন্ধেও উনি খবর রাখেন অনেক।

বলেছিলেন, ‘আমাদের যা কিছু জ্ঞান সম্পদ, সবই তো এসেছে মিশর মারফত। সাইস মন্দিরের পুরুতরা যা-যা বলেছিল সোলনকে, সেই সব উপাখ্যানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কিছু কল্পনা, কিছু সত্যি।’

‘বলেছিল কী?’ স্ক্যানলানের প্রশ্ন।

‘অনেক কথা। এই সবের মধ্যে মুখে মুখে চলে এসেছে কৃষ্ণ আনন অধিপতির কিংবদন্তী। মনে হয়, কালো মার্বেল প্রাসাদের অধিপতিও সে। কেউ কেউ বলে, এরকম অধিপতি ছিল জনা কয়েক। নথিভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু একজনের বৃত্তান্ত।’

‘সেই বৃত্তান্তটা কী, জানতে পারি?’

‘অনায়াসে। সে ছিল মানুষের চেয়েও অনেক বেশি কিছু— অমানুষ বললে হয়তো কিছুটা বলা হয়, শক্তিমত্তা আর কুটিল ব্যাপারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তারই নষ্টামির ফলে ডুবে যায় গোটা আটলান্টিস।’

‘সোডোম আর গোমোরা-র মতো? ঈশ্বরের কোপে ধ্বংস হওয়া দু-খানা শহরের মতো?’

‘সঠিক। একটা সময় আসে যখন সব সীমার বাইরে চলে যায়। প্রকৃতি আর সহ্য করে না। ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে। যার নাম একটু আগে বললাম— কৃষ্ণ আনন অধিপতি—

ব্ল্যাক ম্যাজিকের চূড়ান্ত ঘটিয়েছিল যত্তসব অশুভ শক্তিদের হাতের মুঠোয় এনে, তছনছ কাণ্ড আরম্ভ করেছিল। তাকে মানুষ না বলে শয়তান বলা উচিত। কৃষ্ণ আনন অধিপতির কিংবদন্তী সৃষ্টি হয়েছে এই কাহিনি থেকেই। তাই তার ভয়ানক আলয়ে ঢুকতে চাইছে না সাগরতলের এই সৎ মানুষরা।'

আমি বলেছিলাম, 'আর ঠিক সেই কারণেই ঢুকতে চাই আমি।'

'আমিও,' তাল ঠুকে গেছিল স্ক্যানলান।

প্রফেসর বলেছিলেন, 'আগ্রহটা আমার যে নেই, তা বলব না। কিন্তু যারা আমাদের ঠাঁই দিয়েছে, তাদের নিয়ে যাওয়া যাবে না। এরা অন্ধ কুসংস্কারের ভক্ত, রামভীতু। সুযোগ বুঝে একদিন আমরা তিনজনে যাব।'

সুযোগটা এসেছিল অচিরে। একদিন সকালের দিকে (আমার মোটামুটি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) আটলান্টিয়ানরা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জড়ো হয়েছিল। যে দ্বারপাল দু-জন জলের পাম্প চালানোর দায়িত্বে ছিল প্রবেশ পথে, তাদেরকে এটা-সেটা বুঝিয়ে, তিনজনে বেরিয়ে পড়েছিলাম বাইরে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেছিলাম প্রকান্ড কালো মার্বেল অট্টালিকার মেডুসা-মুন্ডা তোরণের সামনে। ঢুকে গেছিলাম অশুভ শক্তির ঘাঁটির মধ্যে।
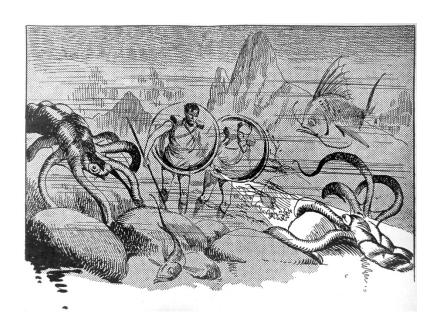
সুপ্রাচীন এই মহানগরের অন্যান্য ভবনের চাইতে অধিকতর উত্তমভাবে সুরক্ষিত থেকেছে এই ব্ল্যাক মার্বেল ম্যানসন। পাথর-টাথর যেখানে যা ছিল, তার কোনওটাই খসে

বা পালটে যায়নি। ফার্নিচার আর ঝোলানো পর্দা-টর্দাগুলোই কেবল বহু আগে উচ্ছন্নে গেছে। সে সবের জায়গায় প্রকৃতি জুগিয়ে দিয়েছে নিজস্ব ঝালর এবং তা নিরতিসীম ভয়ানক। পুরো জায়গাটা অতিশয় ছায়াচ্ছন্ন দম-আটকানো পরিবেশময়। কিন্তু এহেন ছায়ামায়ার মধ্যে প্রকটভাবে বিরাজ করছে দানবিক বিযুক্তদল উদ্ভিদ আর বিদঘুটে বিকট আকারেরর মীন মহাশয়রা— যেন নিশার দুঃস্বপ্ন দিয়ে নির্মিত। বিশেষ করে আমার চোখের সামনে ভাসছে খোলকহীন এক রকমের সামুদ্রিক-শামুক গুটি গুটি সঞ্চারমান সর্বত্র, আর এক রকমের বৃহদাকার কৃষ্ণকায় চ্যাপটা মৎস্য যারা কার্পেটের মতো ছেয়ে রেখেছে সব মেঝে— শুঁড় নেড়ে চলেছে অনবরত— শুঁড়ের ডগা থেকে যেন অগ্নিশিখা ঠিকরে এসে নৃত্য করে চলেছে সর্বত্র। পা ফেলতে হয়েছে হুঁশিয়ার হয়ে, কেননা গোটা আট্টালিকাটাই তো কদাকার প্রাণীতে ঠাসা— দেখলে মনে হয় নিরীহ নয় কেউই— রীতিমতো বিষধর।
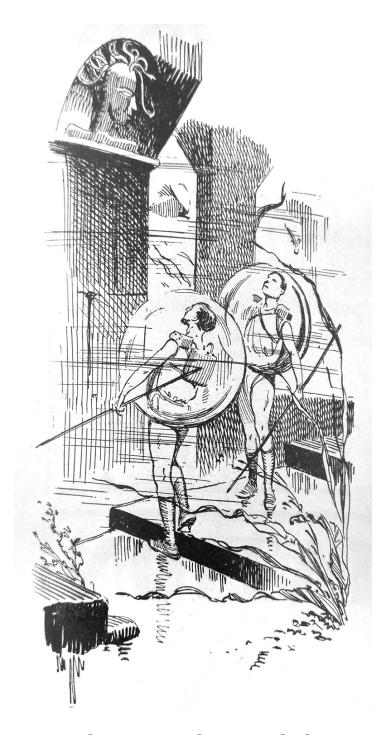
অসাধারণভাবে অলঙ্কৃত গলিপথের পর গলিপথ দেখেছি বিস্তর— দু-পাশে ছোট ছোট ঘর, মস্ত ভবনের ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে কিন্তু প্রকাণ্ড একটা হলঘর— চোখধাঁধানো রকমের জমকালো— সুদিনের সময়ে এমন হলঘর নিশ্চয় গোটা আটলান্টিক মহাদেশে দ্বিতীয় একটা ছিল না। মানুষের হাতে গড়া হলঘর যে এমন অপরূপ হতে পারে, না

দেখলে প্রত্যয় হবে না। ছায়াচ্ছন্ন আলোর মধ্যে দিয়ে ছাদ দেখতে পাইনি, লম্বায় চওড়ায় কোনদিকে কতখানি প্রসারিত— তাও ঠাহর করতে পারিনি। কিন্তু যখন হেঁটে গেছি হাতের আলোর দীপ্তি সামনের দিকে ছিটিয়ে দিয়ে, তখনই স্তম্ভিত হয়েছি আকার আয়তনের বিশালতায়, দেওয়ালে দেওয়ালে মার্ভেলাস খোদাই কর্মের প্রাচুর্যে। অলঙ্করণ করা হয়েছে প্রস্তরমূর্তি আর কারুকাজ দিয়ে, শিল্পনৈপুণ্যের অসাধারণ নিদর্শন, অথচ চিত্তচঞ্চল করার মতো ভয়ানক। নিষ্ঠুরতা আর লাম্পট্য চূড়ান্ত রূপে ফুটে উঠেছে দেওয়ালে দেওয়ালে। ছায়ামায়ার মধ্যে দিয়ে এরা যেন কায়া পরিগ্রহ করে চলেছে দিকে দিকে। শয়তান যদি তন্নিষ্ঠ হয়ে নিজের মন্দির নির্মাণে মনোযোগ দেয়, তাহলে এই সেই মন্দির। শয়তান স্বয়ং যেন নিরতিসীম প্রকট হয়ে রয়েছে এখানকার একটা কক্ষে। ঘরের এক প্রান্তে বিরং এক ধাতু দিয়ে তৈরি চন্দ্রাতপের নিচে— সে ধাতু সুবর্ণ হলেও হতে পারে— লোহিত মার্বেলের একটা সিংহাসনের ওপরে আসীন রয়েছে ভয়াবহ এক বিগ্রহ— মূর্তিমান অশুভ শক্তি— বর্বর, ভ্রুকুটি কুটিল, নির্দয়— আটলান্টিয়ান কলোনির 'বাল' মন্দিরে যেমনটা দেখেছিলাম তেমনি, বরং আরও বিদঘুটে, নিরতিসীম কদর্য। মুখাবয়বে ভয়াবহ শক্তি যেন বিস্ফারিত হয়ে চলেছে। হাতের আলো ফেলে বিকট সেই মুখাবয়ব যখন নিরীক্ষণ করছি স্থানু অবস্থায়, ঠিক সেই সময়ে অতীব আশ্চর্য এবং অতিশয় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ঘটে গেল আমাদের সক্কলের বুকের রক্ত ছলকে দিয়ে। ঠিক পেছনে শুনলাম মনুষ্য কণ্ঠে অতিশয় নির্দয় উচ্চরবের অট্টহাস্য।

আগেই বলেছি, কাচের গোলকের মধ্যে আমাদের মুণ্ড থাকার ফলে বাইরের কোনও শব্দ কানে আসবার কথা নয়। এমন গোলক দিয়ে মাথামুণ্ড ঢেকে কেউ আওয়াজ করতেও পারে না। তা সত্ত্বেও বিদ্রুপের সেই অট্টহাসি আছড়ে পড়েছিল আমাদের প্রত্যেকের কর্ণকুহরে। সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। থ হয়ে গেছিলাম সামনে যে জিনিসটা দাঁড়িয়েছিল, তা দেখে।

অনেক স্তম্ভের একটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা লোক। দু-হাত ভাঁজ করে রাখা বুকের ওপর। হিংস্র দুই চক্ষু মেলে স্থির নয়নে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। শুধু চাহনি দিয়েই বুকের মধ্যে কাঁপন জাগিয়ে দিতে চাইছে। তাকে আমি লোক বলছি বটে, কিন্তু কোনও লোকের মতো সে নয়... এ রকম মানুষ আমি কখনও দেখিনি... অমানুষ বললে সঠিক বলা হয়, যদিও সে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে, কথা বলছে মানুষের মতো, তাহলেও তার কণ্ঠস্বর একেবারেই অমানবিক— আমাদের মতো নয় কোনমতেই। বাহ্যত সে এক

জমকালো প্রাণী, মাথায় সাত ফুটের কম নয়, গড়নপেটন চৌকস ক্রীড়াবিদের মতন, যা আরও পরিস্ফুট গায়ে চেপে বসা বসন পরে থাকার দরুন— যেন চকচকে কালো চামড়া দিয়ে নির্মিত। মুখমন্ডল যেন ব্রোঞ্জ দিয়ে গড়া— ব্রোঞ্জের মূর্তিতে যেমনটা দেখা যায়— বিশ্বের যাবতীয় শক্তি জড়ো করে পিটিয়ে নির্মিত হয়েছে সেই মুখমন্ডল— সেই সঙ্গে শক্তিধর মূর্তি কারিগর এমন শক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়েছে মুখাবয়বের পরতে পরতে, যা ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার চিহ্নমাত্র নেই মুখাবয়বে, কেননা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তো দুর্বলতার নামান্তর, শক্তিমান মুখাবয়বের কোথাও নেই তিলমাত্র দুর্বলতার চিহ্ন। তার বদলে, গোটা মুখখানা যেন পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে, খড়্‌গনাসায় অপরিসীম ঔদ্ধত্য প্রকট হয়ে চলেছে— সেই সঙ্গে সীমাহীন বর্বরতা, ঝোপের মতন কৃষ্ণকালো ভুরু যুগলে অপরিমেয় স্পর্ধা ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে, ধূমায়মান কুচকুচে চক্ষুযুগলে স্ফুলিঙ্গের জাগরণ ঘটছে— গনগন করছে যেন ভেতরকার অগ্নিস্রোতের দরুন! অপরূপ দর্শনধারী নিঃসন্দেহে, কিন্তু অপরিসীম নিষ্ঠুরতায় সদা আচ্ছন্ন, ওষ্ঠ ভঙ্গিমায় বিদ্রুপ, হাসির মধ্যে ব্যঙ্গ।

কথা বলল পরিস্কার ইংরেজীতে এমন এক কণ্ঠস্বরে যেন আমরা সকলেই দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীপৃষ্ঠে, 'ভদ্রমহোদয়গণ, অতীতে অত্যাশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে এসেছেন এখানে, ভবিষ্যতে আরও আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আপনাদের— যদিও আমি তার সমাপ্তি ঘটাব সানন্দে। কথাবার্তা এক তরফা চলছে বলেই মনে হতে পারে, আমি কিন্তু আপনাদের চিন্তা পাঠ করে নিতে পারছি। আপনাদের আদ্যোপান্ত আমার জানা হয়ে গেছে। ভয় পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে কি জানেন, আপনাদের শিক্ষার এখনও অনেক বাকি।'

অসহায় বিস্ময়ে আমরা তিনজনে দেখে নিলাম পরস্পরের মুখের চেহারা। চিন্তা পঠনে কুশল নই বলেই বুঝতে পারলাম না কে কী ভাবছে। আবার কানে ভেসে এল বিদ্রুপঠাসা কর্কশ সেই অট্টহাস্য।

'আর হ্যাঁ, ব্যাপার একটু কঠিন বটে। তবে ফিরে গিয়ে কথা বলতে পারেন প্রাণ খুলে, কেননা আমি যে চাই আপনারা প্রাণ নিয়ে ফিরে গিয়ে আমার দেওয়া বার্তা পৌঁছে দিন। বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই আপানাদের টিকিয়ে রেখেছি, নইলে আমার এ বাড়িতে ঢোকামাত্র পরলোকে পাঠিয়ে দিতাম। আগে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার। ডক্টর

ম্যারাকট, আপনাদের তিনজনের এই দলে আপনিই সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী পুরুষ— বয়সেও প্রবীণ। বাকি দু-জনেরও দুঃসাহসের প্রশংসা করছি— তবে, এ জায়গায় পা না দিলেই ভালো করতেন। শুনতে পাচ্ছেন তো? ভালো। মাথা কাত করে সায় দিলে আরও ভালো হবে।

'ডক্টর ম্যারাকট, আপনি অন্তত জানেন, আমি কে। আবিষ্কারটা করেছেন সম্প্রতি। আমার অজানা কিছুই নেই। আপনারা যা করবেন, যা ভাববেন— সবই আমি জেনে যাই। আমি সর্বজ্ঞ । আমি না চাইলে, আমি না ডেকে পাঠালে এই পুরীতে প্রবেশের ক্ষমতা নেই কারও। আমার গহনতম যজ্ঞবেদী যে এখানেই। এই কারণেই কেউ এখানে আসতে চায় না। বেচারার দল! তাদের কথায় কান দিলে ভালো করতেন। আপনারাই আমাকে নিয়ে এসেছেন আপনাদের সামনে। একবার যখন আমি আসি, সহজে যাই না।

'অকিঞ্চিৎকর পার্থিব জ্ঞান নিয়ে ভাবছেন আমি কে, আমি কী! অক্সিজেন ছাড়া টিকে রয়েছি কীভাবে? কারণ, আমি এখানে থাকি না। থাকি সূর্যের তলায় বৃহত্তর দুনিয়ায়। এখানে আসি যদি আমাকে ডাকা হয়, যেমন ডেকেছেন আপনারা। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস চলে ইথার-এর মাধ্যমে। পৃথিবীর ওপরে পাহাড় চুড়োয় যত ইথার থাকে, এখানেও আছে ততটা। আপনাদের মধ্যেও অনেকে বাতাস ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। মূর্ছারোগগ্রস্তরা মাসের পর মাস শ্বাসপ্রশ্বাস না নিয়ে টিকে থাকে। আমিও তা-ই। তবে সজাগ সক্রিয় যেমনটা দেখছেন।

'ভাবছেন আমার কথা আপনারা শুনছেন কীভাবে। ইথার থেকে বাতাসে বেতার বার্তা যায় কী করে? আমিও সেইভাবে আমার কথা ইথারের মাধ্যমে আপনাদের ওই বিদঘুটে বাতাস গোলকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি।

'আমার ইংরেজী? মন্দ নয় নিশ্চয়। বেশ কিছুকাল ছিলাম মর্তে— সে অনেক... অনেক দিন। কত দিন? এটা এগারো হাজার, না, বারো হাজার বছর? বোধহয় শেষেরটা। অনেক সময়। শিখে নিয়েছি সব মানুষের মুখের ভাষা। আমার ইংরেজি আপনাদের ইংরেজির চেয়ে খারাপ নয়।

'এবার কিছু সিরিয়াস কথা বলা যাক।

'আমি-ই বাল-সিপা। আমি-ই কৃষ্ণ-আনন অধিপতি। প্রকৃতির গূঢ় রহস্য আমার অধিগত। তাই মৃত্যুকে টেক্কা মেরে যাই। ইচ্ছামরণের শক্তি আমার মুঠোয়। যদি কখনও

মরি, তাহলে আমার চাইতে শক্তিমান কিছুর অস্তিত্ব থাকার দরকার। মরলোকের হে মনুষ্যবৃন্দ, অমর হতে চেও না। ভয়ানক অতি ভয়ংকর এই অনন্ত আয়ু। অন্তহীন মনুষ্য সমাজ আসছে আর যাচ্ছে— অমর যে, তাকে থেকে যেতে হচ্ছে। ইতিহাস বয়ে চলেছে, আমি পাশে বসে দেখছি। ইতিহাসে কুঠারাঘাত করার শক্তি আমি রাখি। করিও। করব না কেন?

'জখম করি কীভাবে? সে শক্তি আমার আছে। সে বড় ভয়ানক শক্তি। মানুষের মন টলিয়ে দিতে পারি আমি। জনতার প্রভু আমি। আমিই জনগণেশ। অশুভ শক্তির পরিকল্পনা যেখানে, সেখানে থাকি আমি। হুন বাহিনী যখন আধখানা ইউরোপ তছনছ করেছিল, আমি ছিলাম হুনদের সঙ্গে। সারাসেন-রা যখন ধর্মের নামে তরবারি ধারণ করেছিল, আমার মদতেই তারা তা করতে পেরেছিল, এখনও পৃথিবীর নানান জায়গায় ধর্মের নামে যে তান্ডব বর্বরতা, তার পেছনে আছি আমি। বারথোলোমিউ রজনীতে অভিযান চালিয়েছিলাম আমিই। ক্রীতদাস প্রথার পেছনে ছিলাম আমিই। আমারই মন্ত্রণায় ডাইনি অপবাদ দিয়ে দশ হাজার বুড়িদের পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। প্যারিসের রাস্তায় যখন রক্তনদী বইছে, তখন আমিই সেই দীর্ঘকায় কৃষ্ণ পুরুষ— জনতা পরিচালনা করেছিলাম। রাশিয়াতেও রয়েছি আমি। যেখানে বিক্ষোভ, ইন্ধন জোগাত সেখানে আমি। আমার এই পুরোনো ডেরা এককাট্টা হয়েছিল এতদিন, আপনারাই আমাকে আহ্বান করে নিয়ে এসেছেন এখানে। এলাম ব্যক্তিগত পরিস্পন্দকম্পন-এর দৌলতে অকাল্ট সায়েন্সের এই ভাইব্রেশনের হদিশ আপনাদের আধুনিক বিজ্ঞান আজও পায়নি। আমি জানি সেই মানুষটিকে যিনি গড়েছিলেন সাগরতলের এই শহর। আগন্তুকরা যে এসেছে সেই শহরে, আমি তা জানতে পেরেছি। খোঁজ নিয়েছি, তারপর এসেছি। হাজার বছর পরে এসে এখানকার লোকগুলোর কথা ভাবছি। অনেকদিন টিকে রয়েছে, এবার বিদেয় হোক। এরা টিকে আছে যাঁর দৌলতে, তিনি টেক্কা মেরেছিলেন আমাকে, মহাপ্রলয়কে টেক্কা দিয়ে নগরী নির্মাণ করেছিলেন সাগরতলে। সেই মহাপ্রলয় গ্রাস করেছিল সব কিছু, আমাকেও। তাঁর জ্ঞান ভক্তদের বাঁচিয়েছে, আমার জ্ঞান আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এবার আমার শক্তি ধ্বংস করবে তাদের — রক্ষাকবচ দিয়ে এতদিন যাদের টিকিয়ে রাখা হয়েছে— তবেই শেষ হবে আমার কাজ।'

এই পর্যন্ত বলে বুকের মধ্যে হাত গলিয়ে টেনে বের করল একটা চিরকুট। বললে, 'জল-ইঁদুরদের মোড়লটার হাতে দেবেন এই চিরকুট। যে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে তাদের

ললাটে, আপনারাও যে সেই ভোগান্তির মধ্যে পড়ছেন, তার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু যেহেতু আপনারাই তাদের আসন্ন দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী, তাই বিচারের দন্ড আপনাদের ওপরেও পড়বে। আপনাদের সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে— পরে। ইতিমধ্যে এই সব চিত্রমালা আর খোদাই কর্ম দু-চোখ ভরে দেখে যান— তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার শাসনকালে আটলান্টিসকে কত উঁচু পর্যায়ে আমি নিয়ে গেছিলাম। আমার প্রভাব-আচ্ছন্ন তখনকার মানুষগুলোর আদবকায়দা প্রথা সম্বন্ধেও আপনাদের খানিকটা ধারণা অন্তত হবে। জীবন ছিল কত বৈচিত্র্যময়, কত বর্ণময়, কত দিকে প্রসারিত। এখনকার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার সেই বর্ণময় জীবনধারাকে বলা হয় নিশীথকালের তান্ডব, লম্পট্য। যা খুশি বলুন, রচনা করেছিলাম আমি, উপভোগ করেছি আমি, তাই আমার নেই কোনও পরিতাপ! আবার যদি সুযোগ আসে, ফের যদি সুদিন ফিরে আসে, নতুন করে গড়ব আরও বেশি করে উল্লোল— হল্লাকে টেনে আনব— খেদ থেকে যাবে শুধু আমার এই অনন্ত অমরত্বে। এ ব্যাপারে ওয়ার্দা ছিলেন আমার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানবান— আমার অভিশাপ স্পর্শ করুক তাঁর আত্মাকে— আমার উচিত ছিল জনগণকে খেপিয়ে দিয়ে আমার পেছনে লেলিয়ে দেওয়ার আগেই তাঁকে খতম করে দেওয়া। পৃথিবী দর্শনে তিনি আজও আসেন, মানুষ রূপে নয়, বিদেহী গুরুরূপে। এবার আমি যাই। বন্ধুগণ, কৌতূহল চরিতার্থ করতে এসেছিলেন এখানে। আশাকরি, সেই কৌতূহল মিটেছে।

তারপরেই তাকে দেখলাম অদৃশ্য হয়ে যেতে। হ্যাঁ, আমাদের চোখের সামনেই গলে গলে মিশে গেল জলের মধ্যে। চকিতে নয় যে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, সরে দাঁড়িয়েছিল সেই থাম থেকে একটু তফাতে। চমকদার চেহারার কিনারা অস্পষ্ট হয়ে এল একটু একটু করে। নিভে গেল চোখের দীপ্তি, আবছা হয়ে গেল দেহরেখা। পরক্ষণেই রূপান্তরিত হয়ে গেল কৃষ্ণকালো ঘূর্ণমান মেঘরূপে। ধেয়ে গেল ওপর দিকে ভয়ানক হলঘরের আবদ্ধ জল ঠেলে। তারপর আর সে রইল না। আমরা তিনজনে শ্বাসরোধী সেই মস্ত কক্ষে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলাম নিজেদের মধ্যে। ভাবলাম জীবন কী বিচিত্র। কত সম্ভাবনাময়।
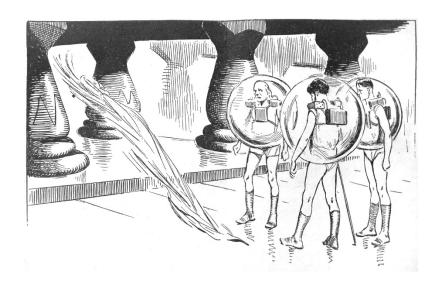
ভয়ানক সেই প্রাসাদে আর আমরা থাকিনি। নিরাপদে টহল দেওয়ার মতো জায়গা তো নয়। স্ক্যানলানের কাঁধ থেকে চিমটি কেটে তুলে এনেছিলাম অতি নচ্ছার খোলকহীন একটা শামুক। মস্ত একটা হলুদ রঙের স্তরীভূত কোলেনকাইমা বিচ্ছিরিভাবে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল আমার হাতে। টলতে টলতে হোঁচট খেতে খেতে যখন বেরিয়ে আসছি, শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলাম রক্ত জল করা খোদাই কাজগুলোর ওপর, তারপর প্রায় দৌড় দিয়েছিলাম আঁধার ঘেরা গলিপথ বেয়ে, এমন জায়গায় পদক্ষেপ করার জন্যে নিজেরাই নিজেদের মুণ্ডপাত করেছিলাম। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম গভীর সমুদ্রের স্বতঃদীপ্ত উপপাতালিক অঞ্চলে পুনরায় পদক্ষেপ করে। বাড়ি ফিরে এসেছিলাম এক ঘণ্টার মধ্যেই। হেলমেট খুলে ফেলে ঘরে গেছিলাম শলাপরামর্শ করার জন্যে। প্রফেসর আর আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে মুখ দিয়ে কথা বের করতে পারছিলাম না। কিন্তু বিল স্ক্যানলানকে এত সহজে দমিয়ে দেওয়া যায় না।

গর্জে উঠেছিল চাপা গলায়, ‘বটে! পেছনে লাগবে হুমকি দিচ্ছে! আমরাও দেখে নেব। খোদ শয়তান! নরক থেকে এসেছিল। তাই অমন পাথরের মূর্তিটুর্তি বানিয়েছে। হারামজাদাকে বাগে আনা যায় কী করে, সমস্যাটা সেইখানেই।’

চিন্তান্বিত অবস্থায় চুপচাপ ছিলেন ডক্টর ম্যারাকট। কিছুক্ষণ পরে ঘণ্টা বাজিয়ে হলুদ বসন পরিচারককে ডেকে ম্যান্ডা-কে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তার হাতে তুলে দিলেন নারকীয় চিঠি।

সেই মুহূর্তে ম্যান্ডা-র প্রশংসা না করে পারিনি। তার সাধের এই শহরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছি আমরা আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে— সেই আমরা যাদের সে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনে ঠাঁই দিয়েছে সুরম্য এই প্রাসাদে। তা সত্ত্বেও আমাদের একটুও তিরস্কার করেনি। চিঠি পড়ে কিন্তু মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে করে ফেলে বিষণ্ণ চোখে শুধু আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর অস্ফুট স্বরে 'বাল-সিপা! বাল-সিপা!' বলতে বলতে চোখের সামনে ক্ষিপ্তের মতো হস্তচালনা করেছিল— যেন মনোদৃশ্যের ভয়াবহতায় মুমূর্ষ প্রায় অবস্থায় পৌঁছেছে। ছুটে বেরিয়ে গেছিল ঘর থেকে সঙ্গী সাথীদের চিঠির বয়ান পড়ে শোনাবে বলে। একটু পরেই শুনেছিলাম ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ— কেন্দ্রীয় হলঘরে শুরু হবে সম্মেলন।

আমি বলেছিলাম, 'যাব কি?'

মস্তিষ্কচালনা করেছিলেন ডক্টর ম্যারাকট।

'গিয়ে কী করব? ওরাই বা কী করতে পারে? খোদ শয়তানের শক্তি যার হাতের মুঠোয়, তার কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা ওদের নেই।'

ফুঁসে উঠেছিল স্ক্যানলান, 'কিন্তু কিছু একটা করতে তো হবে! শয়তানকে খেপিয়ে দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাব নাকি?'

'মতলবটা কী?' আমি প্রশ্ন করেছিলাম বিল স্ক্যানলান সত্যিকারের ডানপিটে বলে। ফিকির-ফন্দিতে গুরুদেব।

'যতটা বড়াই করেছে, অতটা বিশ্বাস না করলেও চলবে। দুর্বল হয়ে পড়েছে বারো হাজার বছরের ধাক্কায়। শক্তিক্ষয় নিশ্চয় ঘটেছে। তাই মুখে অত তড়পানি! বাক্যবাগীশদের দৌড় আমার জানা আছে।'

'তাহলে প্রথম আক্রমনটা আমরাই করব?'

'নিছক পাগলামি!' বাধা দিলেন ডক্টর।

স্ক্যানলান উঠে গেল ওর দেরাজের কাছে। ঘুরে দাঁড়াল হাতে একটা ছ-ঘরা রিভলভার নিয়ে।

বললে, 'স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে পেয়েছিলাম। কাজ সারব এই দিয়ে। কার্তুজ আছে এক ডজন। বারোটা ছেঁদা করে ম্যাজিকগিরি খতম করে দেব! একী! একী! ও লর্ড!'

রিভলভার ছিটকে গেল মেঝেতে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজি খামচে ধরে স্ক্যানলান কাতরাচ্ছে বিষম যন্ত্রণায়। গোটা হাতটার শিরা টেনে ধরেছে, পেশী শক্ত হয়ে

গেছে— গাছের শেকড়ের মতো। ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে আতীব্র যন্ত্রণায়। শেষকালে ছিটকে গেল নিজের বিছানায়।

বললে, 'আমি বাদ। ছ-ঘর রিভলভার দিয়ে শয়তানকে ঠেকানো যায় না। স্যালুট জানাই তাকে।'

ম্যারাকট বললেন, 'উচিত শিক্ষা হয়েছে।'

'কেস তাহলে হোপলেস? কোনও আশা নেই?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে। প্রতিটা কাজ আর কথার ওপর যে নজরদারি রাখছে, তার সঙ্গে কি টক্কর দেওয়া যায়? তা সত্ত্বেও, হাল ছাড়বার পাত্র আমি নই। গায়ের জোর বৃথা। আত্মিক স্তরে যে লড়ছে, তার সঙ্গে এভাবে লড়া যায় না। পড়বার ঘরে যাচ্ছি। দেখি কী করা যায়।'

ম্যারাকটের ওপর বিশ্বাস আমাদের অগাধ। মগজ দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে তাঁর জুড়ি নেই। যে অবস্থায় পৌঁছেছি, যদিও তা মানবিক সামর্থ্যের বাইরে। এক মহাশক্তির খপ্পরে আমরা যেন শিশুর মতন অসহায়। স্ক্যানলান তো ঘুমিয়েই পড়ল। পাশে বসে আমি ভাবতে লাগলাম বাঁচা যায় কী করে। বিপদটা আসবে কোন দিক থেকে এবং কীভাবে? নিশ্চয় মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়বে, গোটা বাড়ি তলিয়ে যাবে, সাগরের জল ছাড়া এ তল্লাটে আর কিছুই থাকবে না।

বিশাল ঘণ্টা ফের বেজে উঠল আচমকা। প্রাচীন প্রাসাদে এরকমভাবে তো ঘণ্টা আগে বাজেনি! এ যে পাগলা ঘন্টির নিনাদ। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার! যে যেখানে আছ, ছুটে এসো এখুনি।

আমি আর স্ক্যানলান দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছি, ডক্টর ম্যারাকট ঢুকলেন ভেতরে। কিন্তু এ কোন ম্যারাকট? এঁর মুখের পরতে পরতে যে রকম আত্মপ্রত্যয় দেখলাম এ রকম তো কখনও দেখিনি। কর্তৃত্বব্যঞ্জক কুলিশ কঠোর মুখভাব। পুঁথিমনস্ক সেই প্রশান্ত মুখচ্ছবি কোথায়? এ যে এক সুপারম্যান! এক মহানেতা! যাঁর মনোবল টলিয়ে দিয়ে যাবে মানবসমাজকে!

বললেন, 'চলুন! সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আর দেরি নয়?'
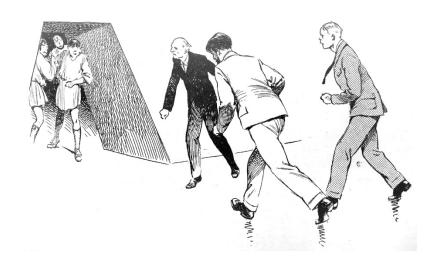
ঠিক এই সময়ে আতঙ্কিত মুখে জনা কয়েক অ্যাটলান্টিয়ান ঘরে ঢুকে হাতের ইশারায় জানাল জরুরি আহ্বান। আমাদের শক্তিমত্তা আর সাহসের পরিচয় এরা পেয়েছে এর আগে। তাই বিপদের সময়ে ডাকছে ব্যাকুলভাবে। হলঘরে যখন ঢুকলাম, তখন যেন স্বস্তির গুঞ্জন শুনলাম। ঘর ভরতি লোক। সামনের আসন রাখা হয়েছে আমাদের জন্যে।

এসেছি সঠিক সময়ে। কিন্তু জানা নেই আমাদের উপস্থিতি কোনও ফয়সালা জোগাতে পারবে কি না। মঞ্চে এসে গেছে ভয়াবহ সেই সত্তা, মুখভাবে অপরিসীম নিষ্ঠুরতা, পাতলা অধরোষ্ঠ শক্ত, যেখানে ভাসছে দানবিক হাসি— ঘর ভরতি লোক ভয়ে কাঠ। একে অপরকে ধরে রয়েছে। নিঃসীম আতঙ্কে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে মঞ্চে দাঁড়ানো মূর্তিমান বিভীষিকার দিকে যার মুখাবয়বের গ্র্যানাইট কঠিন চাহনি নির্নিমেষে দেখে যাচ্ছে আতঙ্ক পাণ্ডুর জনগণকে। প্রত্যেকেরই ত্রাস কম্পিত চাহনি নিবদ্ধ মঞ্চে দন্ডায়মান পৈশাচিক মূর্তিটার দিকে। মৃত্যুর ঘণ্টা যেন বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন শুধু মরণের অপেক্ষা।

ম্যান্ডা একপাশে দাঁড়িয়ে করুণ কণ্ঠে সবার প্রাণভিক্ষা চেয়ে আবেদন জানাচ্ছে, কিন্তু তাতে যেন আরও ফুঁসে উঠছে মূর্তিমান বিভীষিকা। দাবড়ানি দিয়ে ম্যান্ডাকে থামিয়ে দিয়ে শূন্যে এক হাত তুলেছিল অবয়বী আতঙ্ক, সঙ্গে সঙ্গে করুণ আর্তনাদ ঠিকরে এসেছিল হল ঘরের প্রত্যেকের কণ্ঠ চিরে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ডক্টর ম্যারাকট লাফিয়ে উঠে গেলেন মঞ্চে। তাঁর সেই সময়কার মূর্তি দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। অলৌকিক কোনও এক প্রভাবের দরুন তিনি

একেবারে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। আচরণ আর পদক্ষেপ যুবকোচিত। মুখাবয়বে বিধৃত এমনই এক শক্তি যার সমতুল্য শক্তি কোনও মনুষ্য মুখাবয়বে কখনও দেখিনি। তাল ঢ্যাঙা দানবের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি যখন এগিয়ে গেলেন, তখন খোদ শয়তানের মতন সেই আকৃতি চোখ নামিয়ে শুধু তাঁর দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে রইল।

বললে, 'ওহে খুদে মানুষ, কিছু বলবার আছে নাকি?'

ম্যারাকট বললেন, 'আছে বইকী। তোমার সময়সীমা ফুরিয়েছে। এখন বাড়তি সময় নিচ্ছ। পালাও! নরকের দ্বার খোলাই আছে, যাও সেখানে! অমানিশার রাজপুত্র, সময়ের অধিক আর থেকো না। যাও, যেখানে অমানিশা, যেখানে আঁধার, যেখানে তমিস্রা— সেখানে যাও!'

জলন্ত চোখে তাকিয়ে জবাবটা দিল শরীরী বিভীষিকা, 'আমার সময় কখন ফুরোয়, তা মরজগতের মানুষের মুখে শোনার অপেক্ষা আমি রাখি না। আমার সামনে দাঁড়ানোর শক্তি পেলে কোত্থেকে? নিমেষে চূর্ণ করে দিতে পারি তোমার মতো নশ্বর জীবকে— যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ঠিক ওইখানেই।'

জ্বলন্ত চোখে চোখ রেখে দিলেন ম্যারাকট চোখের পাতা না কাঁপিয়ে। আমার তো মনে হল, চোখের পাতা কেঁপে গেল মূর্তিমান সেই শয়তানেরই।

ম্যারাকট বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে, 'ওরে অসুখী সত্তা, শক্তি আছে আমারও, এমনই সেই শক্তি যা দিয়ে তোকে উড়িয়ে দিতে পারি যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস ওইখানেই। ধরণীতে অনেক নৃশংস কদাচার ঘটিয়ে গেছিস তুই তোর অশুভ শক্তি দিয়ে। যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গলদায়ক— সব কিছু নস্যাৎ করে এসেছিস অনেকদিন ধরে। কিন্তু এবার তোর সময় ফুরিয়েছে। ধরণী উজ্জ্বলতর হবে তোর প্রস্থান ঘটলে। ওরে যা! ওরে যা! নরকের কীট, নরকে ফিরে যা!'

সবিস্ময়ে বললে মঞ্চে খাড়া দীর্ঘদেহী আতঙ্ক, 'কে তুই? কী বলতে চাস?'

লক্ষ করলাম, তালঢ্যাঙা এখন তোতলাচ্ছে।

ম্যারাকট বললেন তেজবহ্নিদীপ্ত কণ্ঠস্বরে, 'গুপ্ত জ্ঞানের বড়াই করিস তুই? কিন্তু অশুভ অবশেষে পরাস্ত হয় শুভ শক্তির কাছে। যুগে যুগে তা-ই হয়েছে। নারকীয় সত্তারা দেবদূতদের কাছে হার মেনেছে। এই মুহূর্তে আমি সেই স্তরে উন্নীত হয়েছি— যে স্তরে তুই ছিলিস এতদিন। জয়ের দণ্ড এখন আমার হাতে— এই শক্তি দেওয়া হয়েছে আমাকে,

তোকে নরকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে— মেয়াদ ফুরিয়েছে বলে। তাই বলছি— ওরে যা! ওরে যা! নরকের কীট নরকে ফিরে যা! যা! যা! যা!'
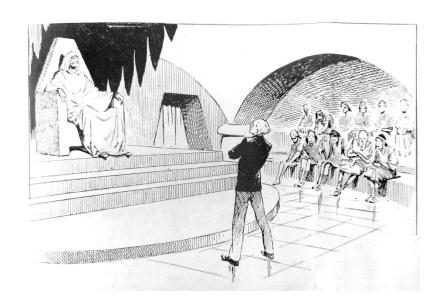
অত্যাশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ। মিনিটখানেক দু-জনে দু-জনের দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইল। একজন কল্যাণী বিদ্যার গুরু, অন্যজন অশুভ শক্তির প্রতীক। তারপরে দীর্ঘদেহী যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে যেতে লাগল একটু একটু করে। বিষম ক্রোধে শূন্যে দু-হাত নিক্ষেপ করে তখনও সে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'ওয়ার্দা, তোর জন্যে আজ আমার এই দশা! মূলে রইছিস তুই!' শেষের দিকে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল কণ্ঠস্বর, একটু একটু করে ঝাপসা হয়ে গেল গোটা অবয়ব, মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর, হাঁটু দুমড়ে গেল পলকা কাঠির মতো, একটু একটু করে নেতিয়ে পড়ল মঞ্চের ওপর। প্রথম দিকে দেখা গেল গুটিশুটি মেরে থাকা একটা মনুষ্যাকৃতি অবয়ব, তারপর আকারবিহীন একটা পিন্ড, পরমুহূর্তেই তলতলে থকথকে খানিকটা কালচে কাদা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে লেপটে গেল মঞ্চে, দূষিত করে দিল বাতাসকে। একই মুহূর্তে আমি আর স্ক্যানলান ধেয়ে গেলাম মঞ্চের দিকে, কেননা শক্তি ফুরিয়ে যাওয়ায় গুঙিয়ে উঠে লুটিয়ে পড়ছেন ডক্টর ম্যারাকট। তখনও বলছেন বিড়বিড় করে, 'জিতে গেলাম! জিতে গেলাম!' সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপ পেল তারপরেই। হতচেতন হয়ে পড়ে রইলেন মঞ্চের ওপর।

*

এইভাবেই অতি ভয়াবহ এক পরিণতি থেকে বেঁচে গেছিল আটলান্টিয়ান কলোনি। পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদেয় হয়েছিল এক অশুভ সত্তা। বেশ কিছুদিন ব্যাপারটা বিশদভাবে বলেননি ডক্টর ম্যারাকট। শোনবার পর থ হয়ে গেছিলাম। সেই দৃশ্য সেদিন চোখে না দেখলে মনে করতাম যা কিছু সেদিন বলেছিলেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে, সবই নিশ্চয় অসুস্থতার ঘোরে প্রলাপের বকুনি। শক্তির আধার হয়ে রূপান্তর ঘটেছিল তাঁর, ঘোর কেটে যাওয়ার পর আবার তিনি আগের মতোই সহৃদয় সদালাপী বিজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ।

বলেছিলেন সোল্লাসে, 'আমার ওপর যে কেউ ভর করতে পারে, আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করে নিতে পারে, এমনটা আমি কস্মিনকালেও ভাবিনি। এ যে একেবারেই অভাবনীয় ব্যাপার, বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। আমাদের দর্শনে অদৃশ্য সত্তার কোনও অস্তিত্ব নেই। আমরা বস্তুজগতের মানুষ। সারা জীবনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা ধুলিসাৎ হয়ে গেল এই একটি ব্যাপারে।'

স্ক্যানলান বলেছিল, 'বাড়িতে যদি কোনওদিন ফিরতে পারি, ছেলেপুলেদের জমিয়ে দেব খাসা এই গল্প দিয়ে।'

আমি বলেছিলাম, 'না বললেই ভালো করবেন। সবাই বলবে, আমেরিকার পয়লা নম্বর মিথ্যেবাদী। এমন কাহিনি আর কেউ বললে আমরাও কি বিশ্বাস করতাম?'

'তা ঠিক। ডক্টর, কীসের দাওয়াই দিলেন শয়তানটাকে, সেটাই তো মাথায় আনতে পারছি না। তবে খাসা বলেছেন। হারামজাদা তল্লাট ছেড়ে উধাও হয়েছে।'

ডক্টর বললেন, 'যা ঘটেছিল, হুবহু তা বলছি। পড়বার ঘরে গিয়ে ভাবছিলাম কী করা যায়। ব্ল্যাক ম্যাজিক আর গুপ্তবিজ্ঞান নিয়ে বেশ কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলাম এককালে। জানতাম, সাদা সবসময়ে কালোকে দমিয়ে রাখে— যদি থাকে একই স্তরে। কালো শয়তান ছিল অন্য এক স্তরে, মরেছে সেই কারণেই।

'সোফায় আছড়ে পড়ে আমি শুধু প্রার্থনা করেছিলাম। প্রার্থনার শক্তি অপরিসীম। ফল ফলেছে তৎক্ষণাৎ। ভিক্ষা চেয়েছিলাম— আশীর্বাদ পেয়েছি।

'আচম্বিতে মনে হয়েছিল, ঘরে আমি একা নই। ঘরে উপস্থিত হয়েছে একটা সত্তা— দয়াবান সত্তা— এক গাল দাড়ি— দয়া মায়া করুণার মূর্ত প্রতিমূর্তি। অপরিসীম শক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছিল সে আমার ভেতরে— স্বয়ং সূর্যকেও টলিয়ে দেওয়ার মতো শক্তি।

স্নেহস্নিগ্ধ চোখে একদৃষ্টে চেয়েছিল আমার দিকে। আমার স্পষ্ট মনে হয়েছিল— এই সেই মহামানুষ, একদা যিনি আটলান্টিসকে বাঁচানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন— হতাশ হয়ে মুষ্টিমেয়দের নিয়ে জলতলে নিবাস রচনা করেছিলেন। বিদেহী সেই সত্তা আজও বিরাজমান জলতলে— উত্তর পুরুষদের কল্যাণ কামনায়। আবির্ভূত হয়েছে সঙিন মুহূর্তে। হাত রেখেছিলেন আমার মাথার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন অগ্নিস্রোত বয়ে গেছিল আমার শিরা উপশিরায়। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল অসাধ্য কিছুই নয় আমার কাছে। মিরাকল ঘটনার মতন মনোবল আর ইচ্ছাশক্তি এসে গেছে আমার ভেতরে। ঠিক তখন শুনেছিলাম বিপুল শব্দের ঘণ্টাধ্বনি। বুঝেছিলাম, এসে গেছে সঙিন মুহূর্ত। সোফা ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়াচ্ছি, বিদেহী সেই গুরু স্মিত মুখে আমাকে উৎসাহ জুগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছিলেন তৎক্ষণাৎ। আমি এলাম মঞ্চে। তারপর কী ঘটেছিল, তা আপনারাই জানেন।'

আমি বলেছিলাম, 'আপনার সুনাম বজায় রেখেছেন। এখন যদি দেবতার বেদীতে গিয়ে বসতে চান, কেউ আপত্তি করবে না।'

স্ক্যানলান বলেছিল একটু বিমর্ষ গলায়, 'রিভলভারে হাত দিতেই আমাকে যে সিঁটিয়ে দেয়, সে আপনার সামনে গুটিয়ে গেল কীভাবে?'

ডক্টর বললেন, 'আপনি বস্তু জগতের স্তরে কেরামতি দেখাতে যাচ্ছিলেন বলে। সে ছিল সূক্ষ্ম স্তরে— তার স্তরেই তাকে মোক্ষম চোট দেওয়ার শক্তি আমাকে জুগিয়ে গেছেন বিদেহী গুরু। শিক্ষা দিয়ে গেছেন আমাকেও। সেদিন থেকে আমার চিন্তা ভাবনা মোড় নিয়েছে সূক্ষ্ম জগতের দিকে— যা থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, সেই দিকে সেই অবিনাশী সত্তার দিকে। আমার ভবিষ্যৎ কাজকর্ম হবে এখন সেই স্তরেই।'

আমাদের নাটকীয় অভিজ্ঞতার সমাপ্তি এইখানেই। এই ঘটনার দিন কয়েক পরেই ঊর্ধ্বজগতে ফিরে যাওয়ার যে পরিকল্পনা করেছিলাম, তার ইতিবৃত্ত আগেই বর্ণিত হয়েছে। ডক্টর ম্যারাকট আবার অগাধ জলধির অতলে নামবার প্ল্যান আঁটছেন। মৎস্যবিজ্ঞান সম্পর্কে নতুন জ্ঞান আহরণের মতলবে। স্ক্যানলান কিন্তু বউ নিয়ে সুখেই আছে। ফিলাডেল ফিয়া-য় প্রোমোশন পেয়ে হয়েছে কারখানার ওয়ার্কস ম্যানেজার। আর আমি পেয়েছি সাগর ছেঁচা মুক্তো— আর কিছু চাই না।

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
পুস্তক তালিকা

কল্পবিশ্ব উপন্যাসপর্ব ১ : ছয়টি কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি ও হরর নভেলা
সম্পাদনা : দীপ ঘোষ, সুপ্রিয় দাস ও সন্তু বাগ

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ২০০ : বিশ্বের প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসকে নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ এমনকী মেরি শেলির কাল্পনিক এক সাক্ষাৎকারের সংকলন
সম্পাদনা : সন্তু বাগ ও সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

কালসন্দর্ভা : অলৌকিক তন্ত্রচর্চার উপর লিখিত এক জটিল কিন্তু আনপুটডাউনেবল থ্রিলার।
লেখক : অঙ্কিতা

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ১ (কল্পবিজ্ঞান) : সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা : সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ২ (কল্পবিজ্ঞান) : সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা : সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সেরা আশ্চর্য! সেরা ফ্যানটাসটিক ১ : আশ্চর্য! ও ফ্যানট্যাসটিক পত্রিকার নির্বাচিত সেরা গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা : অদ্রীশ বর্ধন

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড : হরর সম্রাট এইচ পি লাভক্র্যাফটের একমাত্র উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

অর্থতৃষ্ণা : বাংলার প্রথম স্টিমপাঙ্ক থ্রিলার
লেখক : সুমিত বর্ধন

নক্ষত্রপথিক : দুটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের সংকলন।
লেখক : সুমিত বর্ধন

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৬ : নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা : রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৭ : নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন

সম্পাদনা : রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৮ : নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা : দীপ ঘোষ ও সন্তু বাগ

এইচ জি ওয়েলস কল্পগল্প সমগ্র : কল্পবিজ্ঞান গল্প-উপন্যাসের সংকলন
অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

সবুজ মানুষ : সবুজ মানুষদের নিয়ে নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন।
সম্পাদনা : অদ্রীশ বর্ধন, সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আদিম আতঙ্ক : কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার উপন্যাস
লেখক : অদ্রীশ বর্ধন

রেবন্ত গোস্বামী কল্পবিজ্ঞান সমগ্র : রেবন্ত গোস্বামীর সমস্ত কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কবিতা ও সাক্ষাৎকার।
সম্পাদনা : সুদীপ দেব

আদম ও ইভ : কল্পবিজ্ঞানের গল্প সংকলন
লেখক : অমিতাভ রক্ষিত

মনন শীল : তিনটি ইয়ং অ্যাডাল্ট বায়ো থ্রিলার
লেখক : পার্থ দে

ডেকাগন : কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার সংকলন
লেখক : ঋজু গাঙ্গুলী

ভয়াল রসের সম্রাট-এইচ পি লাভক্রাফট : শ্রেষ্ঠ বারোটি রচনা, সটীক সংস্করণ।
সম্পাদনা : সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

স্বমহিমায় শঙ্কু : দুটি অসমাপ্ত শঙ্কু-কাহিনির সম্পূর্ণ রূপ
লেখক : সত্যজিৎ রায় ও সুদীপ দেব

রণেন ঘোষ রচনা সমগ্র ১ : রণেন ঘোষের কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও গল্পের সংকলন
সম্পাদনা : সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আগামীর সাত মুখ : স্প্যানিশ কল্পবিজ্ঞান লেখক কার্লোস সুচলওস্কি কনের সাতটি কল্পবিজ্ঞান গল্পের সংকলন
অনুবাদ : সৌরভ ঘোষ ও রমা সরকার দাস, সম্পাদনা : অঙ্কিতা